প্রবন্ধসার

প্রথম ভাগ।

আনন্দচন্দ্র মিত্র প্রণীত।

কলিকাতা

২১০।৩ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ-যন্ত্রে,
শ্রীমণিমোহন রক্ষিত দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

১৮০৪ শকঃ।

ভূমিকা।

বঙ্গভাষার প্রসার অতি সামান্য। অতএব যাহা অধ্যয়ন করিলে সাহিত্যানুশীলনের সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনচিন্তা সৎসাহস ও স্বদেশানুরাগের উদ্রেক হয়, বাঙ্গলা সাহিত্যে এরূপ গ্রন্থ অতি বিরল। যাঁহারা জাতীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা করিতে যত্নশীল এই অভাব তাঁহারাই সমধিক অনুভব করিয়া থাকেন। এই অভাব অনুভব করিয়াই কতিপয় কৃতবিদ্য স্বদেশ-হিতৈষী শ্রদ্ধেয় বন্ধু বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী করিয়া কয়েকখানি গ্রন্থ প্রণয়ন করিতে আমাকে অনুরোধ করেন, তদনুসারেই এই প্রবন্ধসার প্রচারিত হইল। ঈদৃশ গুরুতর কার্য্যের পক্ষে আমি অনুপযুক্ত। যদি কথঞ্চিৎও কৃতকার্য্য হইয়া থাকি, শ্রম সফল মনে করিব।

এই পুস্তকে যে সকল প্রবন্ধের অবতারণা করিয়াছি, তাহার শেষ করিতে আমার সম্পূর্ণ স্বাধীনতা ছিল না, অনেক স্থলে চিন্তা সংযত করিয়াছি, ভাব ও ভাষা বিদ্যালয়ের পাঠোপযোগী করিবার জন্যও সর্ব্বদা সতর্ক থাকিতে হইয়াছে। ইংরেজীর অনুবাদ বা বিবিধ বাঙ্গলা গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিলে পথ সুগম হইত সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহা না করিয়া দরিদ্র বঙ্গভাষার মৌলিকতা বৃদ্ধি বিষয়ে যথাসাধ্য যত্ন করাই অগ্রে কর্ত্তব্য। এই সকল কথা মনে রাখিয়া শিক্ষা-সমাজের সুবিজ্ঞ কর্ত্তৃপক্ষীয়েরা এবং সহৃদয় পাঠকবর্গ অপরিহার্য্য ত্রুটী উপেক্ষা করিয়া আমাদিগের উৎসাহ বর্দ্ধন করিবেন—এই প্রার্থনা।

১লা আশ্বিন,
১২৮৯ সাল।

গ্রন্থকার

সূচীপত্র।

প্রবন্ধসার

প্রথম খণ্ড।

জাতীব চরিত্র ও স্বদেশেব শ্রীবৃদ্ধি।

জন্মভূমিব জন্য যাহাব প্রাণে অনুরাগ নাই, স্বদেশেব ভাবনা যাহাব মনে উপস্থিত হয না, স্বজাতির মঙ্গল কামনায় যাহার হৃদয আকুল হয না, সে ব্যক্তি অসাব ও অপদার্থ, অথবা অস্বাভাবিক ও পাপীষ্ঠ। যে দেশেব অন্নজলে শবীর পোষণ হইতেছে, যে দেশের লোকেব পবিচর্য্যায লালিত পালিত ও শিক্ষিত হওয়া যায়, যাহাদিগেব নিকট কথা কহিতে শিখিযা মনুষ্যত্ব লাভ কবা যায, আব যাহাদিগের সঙ্গে ভালবাসার বিনিময় হয বলিযা সংসাব এরূপ সুখের আবাস হইযা থাকে, সে দেশের জন্য—সে সকল লোকেব জন্য ভাবনা করিতে যে অবসব পাযনা, তাহাকে কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ হতভাগ্য ও কৃপাপাত্র ভিন্ন আর কি বলিতে হইবে?

আর এক শ্রেণীর লোক আছে, তাহাদিগের অন্তঃকরণ যেন অস্বাভাবিক উপকরণে গঠিত হইয়াছে,—আবার অস্বাভাবিক শিক্ষা লাভ কবিযা ঘোবতর স্বার্থপব হইয়া উঠিয়াছে। তাহাবা কৃতজ্ঞতা, ভ্রাতৃভাব ও উপচিকীর্ষা প্রভৃতি সদ্গুণগুলিকে স্বার্থপরতার চরণে উৎসর্গ করিয়া নিরন্তর "আমি আমার" মন্ত্র যপ কবিতেছে, এবং যারপব নাই অপরি-

ণামদর্শিতাই প্রদর্শন করিতেছে। তাদৃশ স্বদেশানুরাগবিহীন দুর্জ্জনদিগকে শ্বাপদ স্বভাব বিশিষ্ট পাপীষ্ঠ না বলিয়া আর কি বলিব? প্রত্যুত যাহার বিন্দুমাত্রও মনুষ্যত্ব আছে, তাহারই অন্তরে স্বদেশের চিন্তা ও স্বজাতির মঙ্গল কামনার উদ্রেক হয়, জন্মভূমির শ্রীবৃদ্ধিসাধনে যত্নপর হওয়া তাহারই সর্ব্বথা কর্ত্তব্য।

পণ্ডিতেরা বলেন,—জ্ঞানবৃদ্ধি, ধনবৃদ্ধি ও বাহুবলবৃদ্ধি হইলেই স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন হয়। যুগপৎ এই ত্রিবিধ উন্নতি স্বদেশের সৌভাগ্যের লক্ষণ বটে, কিন্তু এরূপ উন্নতির মূল কারণ চরিত্র। যাহার চরিত্রে বল নাই, তাহার বিদ্যাবত্তা বা চিন্তাশীলতা দিবাস্বপ্ন বই কিছুই নহে; অথবা চরিত্রগত উৎকর্ষ সাধন যাহার লক্ষ্যের বহির্ভূত, প্রকৃত শিক্ষা ও চিন্তাশীলতা তাহার আয়ত্তই নহে। কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য দ্বারা স্বদেশের ধনবৃদ্ধি করিতে হইলে অগ্রে পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও উদ্যমশীলতার প্রয়োজন। যাহার সাহস নাই, তাহার দৈহিক বল পশুবল অপেক্ষাও নিকৃষ্ট। আর যে ব্যক্তি চিত্তসংযম অভ্যাস করে নাই, বাহুবল উপার্জ্জন করা, বাহুবল রক্ষাকরা, বা বাহুবলের সদ্ব্যবহার করা তাহার পক্ষে অসম্ভব।

অতএব স্বদেশের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে চরিত্রগঠনের প্রয়োজন। সমাজ মধ্যে দুই চারি ব্যক্তি গঠিতচরিত্র হইলে সেই প্রয়োজন সাধিত হয় না। ঘনঘটাচ্ছন্ন গগনমণ্ডলে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দুই চারিটী নক্ষত্রের ক্ষীণ জ্যোতিঃ যেমন নিবিড় অন্ধকারে বিলীনপ্রায় থাকে, সমাজ মধ্যে দুই এক ব্যক্তির চরিত্রবল সেইরূপ অতি অল্পই কার্য্য করিতে পারে। স্বদেশকে সমুন্নত করিতে হইলে, স্বদেশের প্রকৃত শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিতে হইলে, সমাজের অধিকাংশ লোকের চরিত্র গঠনের প্রয়োজন; জাতি সাধারণের চরিত্রের উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। সুশিক্ষাদান ও

সদ্দৃষ্টান্ত প্রদর্শন করিয়া যখন কোন দেশের অধিকাংশ লোকের চরিত্র গঠন করাযায়, তখন সে স্থানের জলবায়ুরই যেন এমন ধর্ম্ম হইয়া উঠে যে, সেস্থানে যে জন্ম গ্রহণ করে, অল্প বা অধিক পরিমাণে তাহার চরিত্রে কতকগুলি স্বাভাবিক সুলক্ষণ প্রকাশপায়। ইহারই নাম জাতীয় চরিত্র। যত দিন কোন দেশে এইরূপ জাতীয় চরিত্র গঠনের সদুপায় না হয়, তত দিন সে দেশের শ্রীবৃদ্ধি সুদূরপরাহত। কর্ষিত ভুমিতেই যেমন সুশস্য জন্মিবার সুবিধা হয়, জাতীয় চরিত্র অবলম্বন করিয়াই সেইরূপ কোন দেশের জ্ঞান, ধন ও বাহুবলের উন্নতি হইতে থাকে।

জাতীয় চরিত্র কি, এবং উহার কি আশ্চর্য্য প্রভাব, ভিন্ন ভিন্ন জাতির ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিলে সুন্দররূপে উপলব্ধি করাযায়। প্রাচীন কালে একবার আধ্যাত্মিকতা ভারতবর্ষীয়দিগের জাতীয় চরিত্রের লক্ষণ হইয়াছিল। সে সময়ে ভারতের আবালবণিতা সকলেই যেন ইহজীবনকে উপেক্ষা করিয়া পরকালের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া থাকিতেন,—ইহজীবনের সমস্ত কার্য্যের মধ্যেই যেন কেবল পারলৌকিক সম্পদ লাভের আয়োজন করিতেন। কি সন্তানকামনা, কি যজ্ঞাদির অনুষ্ঠান, কি বিগ্রহাদি কার্য্য, প্রায় সমস্তই যেন তাঁহারা পারলৌকিক শুভসাধনের জন্য করিতেন।

ইদানীন্তন কালে স্বদেশানুরাগ ইউরোপীয়দিগের জাতীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত হইয়াছে। ইউরোপীয় মন্ত্রীসম্প্রদায় গুরুতর মতদ্বৈধ বশতঃ পরস্পর কত বিবাদই না করিয়া থাকেন, সময়ে দ্বন্দ্বযুদ্ধ করিতেও কুণ্ঠিত হয়েন না; কিন্তু যাই স্বদেশের স্বার্থের ব্যাঘাত হইবার উপক্রম হইল, আর সকলে একবাক্য, যাই স্বদেশের বিপদ-সম্ভাবনা হইল, অমনি সকলে মিলিয়া বক্ষ-

স্থল পাতিয়া দিতে প্রস্তুত হইলেন; মতদ্বৈধ ও প্রতিযোগীতা একেবারে বিস্মৃত হইয়া গেলেন। দূরবর্ত্তী সাগরগর্ভে ক্ষুদ্র দ্বীপবাসী হইয়াও, যে ইংরেজ জাতির এত প্রতিপত্তি, ইহা তাহাদিগের অনুপম স্বদেশানুরাগের সাক্ষাৎ পুরস্কার স্বরূপ। ধন্য সেই চিকিৎসক, যিনি দিল্লীশ্বরের নিকট প্রভূত ধনরত্ন পুরস্কার না চাহিয়া, ভারত-সাম্রাজ্যে স্বদেশীয়দিগের বাণিজ্যাধিকার যাচনা করিয়াছিলেন। জাতীয় চরিত্রের অভাবে মানুষ মানুষ থাকে না, জাতীয় চরিত্রের প্রভাবে মনুষ্য দেবতা হয়।

মধ্যকালে স্বাধীনতা ও অস্ত্রচালনায় অনুরাগ রাজপুতদিগের জাতীয় চরিত্রের লক্ষণ হইয়া পড়িয়াছিল। যে ব্যক্তি স্বাধীনতারক্ষার্থ সম্মুখসংগ্রামে পরাঙ্মুখ হইত, রণমত্ত রাজপুতেরা তাহাকে মেষ অপেক্ষা অসহায় ও শৃগালাধম কাপুরুষ মনে করিত। রাজপুতেরা সহোদর অপেক্ষা শানিত অসির সমধিক ভরসা করিত, এবং তরবারি সঞ্চালন করিয়া সত্যের পরীক্ষা ও বিবাদের মীমাংসা করিত। কথিত আছে, একদা দুই বলবান ক্ষত্রিয় নন্দন কথায় কথায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হয়, এবং এক জন অন্যতরকে নিহত করে। বলবান ক্ষত্রিয়সুত প্রতিদ্বন্দ্বীকে এমনই সজোরে তরবারি প্রহার করিয়াছিল যে, শাণিত তরবার বাম স্কন্ধে প্রবেশ করিয়া দক্ষিণ পার্শ্বদেশ দিয়া বহির্গত হইয়াছিল। পুত্রের নিধনবার্ত্তা শ্রবণে বৃদ্ধ জনক ঊর্দ্ধশ্বাসে বিবাদস্থলে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাঁহার ক্ষত্রিয় প্রাণ অস্ত্রচালনায় পারদর্শীতার এমনই পক্ষপাতী ছিল যে, পুত্রের মৃত দেহ দেখিবামাত্র বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন "আহা, কি আশ্চর্য্য অস্ত্র, আর কি চমৎকার চালনা শক্তি, ঠিক যেন যজ্ঞসূত্রাকারে ছেদন করিয়াছে!" এই কথা উচ্চারণ করিবার পরক্ষণেই বৃদ্ধ নিদারুণ

পুত্রশোকে আকুল হইয়া পড়িলেন। অপত্যস্নেহের অনিবার্য্য প্রভাব কে লঙ্ঘন করিতে পারে? কিন্তু জাতীয় চরিত্রের কি অসীম ক্ষমতা, প্রথম দৃষ্টিতে পুত্রশোককেও পরাভূত করিয়াছিল! স্বাধীনতা বল, সত্যনিষ্ঠা বল, সৎসাহস বল, আর স্বদেশানুরাগ বল, এ সকল যদি জাতীয় চরিত্রের অঙ্গীভূত না হয়, এ সকল ভাব যদি জাতিসাধারণের হৃদয়ের প্রিয় সামগ্রী না হয়, তবে কোনজাতির অভ্যুদয় কল্পনা বই আর কিছুই নহে। জাতীয় চরিত্র এ সংসারে কল্পতরু সদৃশ, উহা জনসমাজে অমৃত ফল প্রসব করিয়া থাকে।

জাতীয় চরিত্র সংগঠন ও সমুন্নত করিতে হইলে জাতীয় শিক্ষার সুব্যবস্থা করা আবশ্যক। জনসমাজে শিক্ষার প্রথম স্থল গৃহ অথবা পরিবার। যে পরিবারে অজ্ঞতা বা কুসংস্কার, আলস্য বা কুরুচি, অথবা স্বেচ্ছাচার বা নাস্তিকতা বিরাজ করিতেছে, সেই পরিবারে জন্ম গ্রহণ করিয়া সুচরিত্র হওয়া সুদূরপরাহত। শিশু ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি পিতা মাতা ভ্রাতা ভগিনী প্রভৃতি আত্মীয়গণের চরিত্রদ্বারা অনুপ্রাণিত হইতে থাকে। কোমল মৃত্তিকায় মূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া শুষ্ক অথবা দগ্ধ করিলে যেমন আর তাহার ভঙ্গীর পরিবর্ত্তন হয় না, সেইরূপ শিশুর সুকুমার চরিত্রে যে সকল ভাব সংক্রামিত হয়, উত্তর কালে কঠোর সাধনা করিয়াও তাহার পরিবর্ত্তন ঘটান সুকঠিন হয়। অতএব যাহাতে প্রত্যেক পরিবারেই পারিবারিক বন্ধনের স্বাভাবিকতা, দাম্পত্য প্রেমের পবিত্রতা, পরিবারের লোক-দিগের চরিত্রে সাহস, শ্রমশীলতা ও নিষ্ঠা রক্ষিত হইতে পারে, তজ্জন্য বিশেষ সতর্কতার প্রয়োজন।

স্বদেশীয় এবং বিদেশীয় ইতিবৃত্ত অধ্যয়ন করিলে আমরা দেখিতে পাই, জননীপ্রদত্ত বাল্যশিক্ষার অপার মহিমা। প্রকৃ-

তির নিয়ম এই, যে যাহাকে ভাল বাসে ও বিশ্বাস করে, সেই তাহার অনুকরণ করে; জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে তাহার চরিত্রের ভাব তাহাতে অনুপ্রবিষ্ট হয়। বালক বালিকা এ সংসারে জননীর মত আর কাহাকে ভাল বাসে? এমন অটল ও সরল বিশ্বাসের ভূমি আর কাহাকে মনে করে? মহাযোগী প্রতিদিন ধ্যানযোগে চরিত্রে যে পবিত্রতা লাভ করিতে পারেন না, পুণ্যশীলা জননীর চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বালকবালিকা প্রতিদিন তদপেক্ষা অধিকতর চরিত্রগত উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে। পুরাণে লিখিত আছে, সূর্য্যবংশাবতংস ধ্রুব জননীর উপদেশ এবং নির্ভরশীলতাতেই এরূপ ভগবদ্ভক্ত হইয়াছিলেন, এবং অলৌকিক তপস্যা করিয়া অপার্থিব সুখের অধিকারী হইয়াছিলেন।

রোমের পুরাবৃত্তে একটী সুন্দর ঘটনার উল্লেখ আছে। একদা কোন ঐশ্বর্য্যশালিনী রমণী রোমীয় ইতিহাসের অলঙ্কার স্বরূপ গ্রেকাই নামক ভ্রাতৃগণের জননীকে আপনার বহুমূল্য রত্নরাজি দেখাইয়া ঈষৎ গর্ব্বিতভাবে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, "তোমার কি কি মূল্যবান রত্ন আছে, দেখাইতে পার কি?" গ্রেকাইজননী তৎকালে তাঁহার কথার কোন উত্তর দিলেন না, ক্ষণপরে পুত্রগণ বিদ্যালয় হইতে প্রত্যাগমন করিলে, তাহাদিগকে নির্দ্দেশ করিয়া প্রাগুক্ত রমণীকে কহিলেন,—"এই আমার অমূল্য রত্নসকল দেখিয়া লও।" বাস্তবও রোমক জননী পার্থিব ধন রত্নাদিকে এরূপ অকিঞ্চিৎকর মনে করিতেন বলিয়াই, রোমের বীর পুরুষেরাও ত্যাগস্বীকারের জ্বলন্ত দৃষ্টান্তসকল প্রদর্শন করিয়াছেন, অযাচিত বিপুল বৈভব উপেক্ষা করিয়াও অনেক সময়ে স্বকীয় মনুষ্যত্ব ও স্বজাতির গৌরব রক্ষা করিয়াছেন।

মধ্যকালে দিনেমার দস্যুদিগের হস্ত হইতে যিনি ইংলণ্ডকে নির্ম্মুক্ত করেন, জন্মভূমির দুঃখ দূর করিবার জন্য রাজপুত্র

হইয়াও যিনি ভিখারীর বেশে ভ্রমণ করিয়াছিলেন, সেই মহাপুরুষ আলফ্রেড, তাঁহার প্রাথমিক শিক্ষা গুণবতী জননীর নিকটে লাভ করিয়াছিলেন। মহাপণ্ডিত সর্ উইলিয়ম জোন্স বহু ভাষায় ও বিবিধ বিদ্যায় অদ্ভুত পারদর্শিতা প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন। বাল্যশিক্ষা তিনিও বিদুষী জননীর নিকটেই লাভ করেন। বালক জোন্স যখনই কোন বিষয়ে তত্ত্বজিজ্ঞাসু হইতেন, জননী তখনই বলিতেন "পাঠ কর, তাহা হইলেই জানিতে পারিবে।" কে না বলিবে, যে এই মূলমন্ত্র অবলম্বন করিয়াই সর্ উইলিয়ম অসীম বিদ্যাবত্তা লাভ করিয়াছিলেন? সংসারে এরূপ শত শত দৃষ্টান্ত দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এদেশে প্রকৃত চরিত্র-গঠন করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রে পরিবারের রমণীদিগকে সুশিক্ষিতা ও সদ্গুণশালিনী করা কর্ত্তব্য। প্রস্রবণের মূলদেশ আবর্জ্জনাপূর্ণ থাকিলে, সমস্ত স্রোতজল নিশ্চয়ই আবিল ও দুর্গন্ধময় হইবে সন্দেহ নাই।

জাতীয় শিক্ষার দ্বিতীয় স্থল বিদ্যালয়। জীবনের উন্নতির ও অবনতির অনেক বীজ এই স্থলেই চরিত্রমধ্যে রোপিত হইয়া থাকে। ইংলণ্ডের ইতিহাসের উজ্জ্বল রত্ন মহাত্মা ডিউক অব্ ওয়েলিংটন বাল্যকালে ইটন বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন; পরিণত বয়সে একবার তথায় উপস্থিত হইয়া কহিয়াছিলেন,—"এই বিদ্যালয়ের ক্রীড়াভূমিতে অঙ্গসঞ্চালন করিয়াই আমার বাহুতে সেই বল অর্জ্জিত হইয়াছিল, যে বলে উত্তরকালে মহাবীর নেপোলিয়ান বোনাপার্টিও পরাজিত হইয়াছেন।" বিদ্যালয়ে শিক্ষার উৎকর্ষ সাধন করিতে হইলে অধ্যাপক, অধীত গ্রন্থ ও অধ্যাপন-প্রণালী প্রকৃষ্ট হওয়া চাই। ব্যাধের কুক্কুর যেমন অনর্থক প্রাণীহিংসা করিতে আমোদ অনুভব করে, হীনচরিত্র গুরুর শিষ্যদিগের রুচিও সেইরূপ অলক্ষিতভাবে দুষ্কার্য্যের প্রতি

ধাবিত হয়। যে সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিলে স্বাধীন চিন্তা, সৎসাহস ও স্বদেশানুরাগ প্রভৃতি সদ্গুণের উন্নতি হয় না, তাদৃশ গ্রন্থ বিদ্যালয়ের পঠনার বহির্ভূত রাখাই শ্রেয়ঃ। কিন্তু অধীত গ্রন্থ অপেক্ষা অধ্যাপনপ্রণালীর উপরেই শিক্ষার সারবত্তা অধিকতর নির্ভর করে। যে পুষ্পকোটরে মধুমক্ষিকা মধু সংগ্রহ করে, লূতা তাহাতেই হলাহল উৎপাদন করিয়া থাকে। অসচ্চরিত্র শিক্ষকের শিক্ষাদানে অধিকারমাত্র নাই। গোপনে দুষ্কার্য্য করিয়া বাহিরে তদ্বিরুদ্ধে উপদেশ প্রদান করিতে যাহার চিত্ত বিন্দুমাত্রও কুণ্ঠিত হয় না, তাদৃশ অস্বাভাবিক লোকের সংখ্যা নিতান্তই বিরল সন্দেহ নাই।

কেবল ইহাই নহে ;—সৎপ্রসঙ্গ উপস্থিত করিবামাত্র যাহার অন্তরে আবেগ, উৎসাহ ও আনন্দ না জন্মে, এবং হৃদয়ের সেই আবেগ শিষ্যদিগের প্রাণে ঢালিয়া দিতে যাহার ব্যাকুলতা না জন্মে, সে ব্যক্তি শিক্ষাদানের সম্পূর্ণ অনুপযুক্ত। কিন্তু মরুক্ষেত্রে জলসিঞ্চন করিলে কোনই ফল ফলে না, কাষ্ঠমূর্ত্তিতেও লাবণ্যসঞ্চার করা সহজ ব্যাপার নহে। সেইরূপ অমনোযোগী অথবা অবিনীত শিষ্যের চরিত্রে বল ও সৌন্দর্য্য প্রদান করাও উপদেষ্টার অসাধ্য। কালিদাসের কবিতা পাঠ করিতে করিতে গুরুশিষ্য উভয়েরই অন্তর যদি বাহ্য জগতের সৌন্দর্য্য সাগরে নিমগ্ন হইয়া সকল সৌন্দর্য্যের মূলাধার পরমেশ্বরে প্রীতি সংস্থাপন করিতে না পারে, সেক্ষপীয়েরর প্রতি পত্র পাঠ করিয়া যদি গুরু শিষ্য উভয়েরই চক্ষু মানব হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিয়া পাপের ভীষণ মূর্ত্তিকে ধিক্কার ও পুণ্যের বিমল সৌন্দর্য্যকে সমাদর করিতে না পারে, তবে বিদ্যালয়ে কাব্যালোচনার প্রয়োজন কি? ইতিহাস পাঠ করিয়া যদি অন্তঃকরণে সৎসাহস ও স্বদেশানুরাগ উদ্দীপ্ত না হয়, তবে উহা পাঠ করা বিড়ম্বনা

মাত্র। যে ব্যক্তি আমেরিকা ও তাহার আবিষ্কার-বৃত্তান্ত অবগত আছে, কিন্তু সেই সঙ্গে কলম্বসের অষ্টাদশবর্ষ-ব্যাপী কঠোর তপস্যা স্মরণ করিয়া উৎসাহ ও শ্রদ্ধাতে যাহার হৃদয় পরিপূর্ণ হয় না, সে অতি অদ্ভুত মনুষ্য। শিক্ষকের মধ্যে বিদ্যাবত্তা ও সহৃদয়তা এবং শিষ্যের মধ্যে বিনয় ও সদিচ্ছা থাকিলেই চরিত্রে শিক্ষার যথার্থ ফল ফলিতে পারে। সুশিক্ষাদান অতি মহৎ ধর্ম্মানুষ্ঠান স্বরূপ, চরিত্রহীনের উহাতে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার নাই। সুশিক্ষা লাভও ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ স্বরূপ, অতএব মস্তক পাতিয়া উহা গ্রহণ করিতে হয়। পাদুকাকারও পুষ্পমাল্য রচনা করিতে জানে না; অসার ও চঞ্চল ভিত্তিতেও অট্টালিকা গঠিত হইতে পারে না।

কিন্তু কেবল বিদ্যালয়েই শিক্ষার পরিসমাপ্তি হয় না। অনন্ত উন্নতিশীল মানবাত্মার পক্ষে সমগ্র জীবন-কালকে শিক্ষার কাল বলিতে হইবে। বাল্যকালের উপার্জ্জিত ভাব সকল হৃদয়ে জাগ্রত রাখিবার জন্য, যৌবনের চিন্তা সকল পরিপক্ক করিবার জন্য, এবং হৃদয়ের ভাব ও মনের চিন্তা কার্য্যে পরিণত করিবার জন্যও মানুষের চিরকাল সচেষ্ট ও সাবধান থাকা কর্ত্তব্য। জীবনের কার্য্যক্ষেত্রকে এক দিকে জ্ঞান ও সদ্ভাব উপার্জ্জনের পথ ও অপরদিকে স্বকীয় চরিত্র পরীক্ষার উপযোগী করিয়া রাখা উচিত। যাঁহারা প্রাথমিক শিক্ষাকেই পর্য্যাপ্ত মনে করেন, বিদ্যালয় পরিহার করিয়া আর আত্মোন্নতির চেষ্টা করেন না, তাঁহারা নিতান্তই ভ্রান্ত। যে ব্যক্তি অল্প সঙ্গতি লইয়া বাণিজ্য আরম্ভ করে, মূল-ধন বৃদ্ধির চেষ্টা না করিলে নিশ্চয়ই তাহাকে ব্যর্থ-মনোরথ হইতে হয়। বৎসর কতিপয় বিদ্যালয়ে যে উপদেশ বা অভ্যাসের বশবর্ত্তী হওয়াযায়, মানুষের জীবনপথে উহা তাদৃশ অল্প সঙ্গতি ভিন্ন কিছুই নহে। উহাতে সংগ্রাম-সঙ্কুল

মানব জীবনে চরিত্র উন্নত করিতে বা অক্ষুণ্ন রাখিতে পারে না। বিদ্যালয়ে কতক কাল শিক্ষিত হইয়া যাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসেন, অথবা বিদ্যাবত্তার অভিমান করেন, তাঁহারা যার পর নাই অল্পবুদ্ধি; তাদৃশ লোকদিগের কুদৃষ্টান্তে যুবকসমাজে জাতীয় চরিত্র গঠনের বিলক্ষণ ব্যাঘাত ঘটে। যিনি ইদানীন্তন কালের অলঙ্কার স্বরূপ, যাঁহার সাধুতা ও চিন্তা-শক্তি জগতের নমস্য, সেই মহাপুরুষ নিউটন এক দিন সরল ভাষায় বলিয়াছিলেন "আমি বেলাভূমি হইতে বালকের মত উপলখণ্ডই সংগ্রহ করিতেছি, জ্ঞানসমুদ্র পুরোভাগে অক্ষুণ্ন রহিয়াছে!"

জাতীয় চরিত্র সমুন্নত করিতে হইলে জাতীয় সাহিত্যের উৎকর্ষবিধান আবশ্যক। উৎকৃষ্ট ইতিহাস, দর্শন ও কাব্য দ্বারা মাতৃভাষাকে পুষ্ট করিতে পারিলেই জাতীয় সাহিত্যের উন্নতি সাধন করা হয়। বিজাতীয় ভাষা আমাদিগের শিক্ষণীয় বটে, বিদেশীয় সাহিত্যও আমাদিগের আলোচ্য, সন্দেহ নাই; কিন্তু মাতৃভাষার উন্নতি যত দিন না হইবে, জাতীয় সাহিত্য যত দিন উৎকর্ষ লাভ না করিবে, ততদিন স্বদেশের উন্নতি অসম্ভব। যেহেতু বিজাতীয় ভাষার সঙ্গে জাতিসাধারণের নিকট সম্বন্ধ সংস্থাপিত হইতে পারে না। পরন্তু মাতৃ ভাষা হৃদয়ে যত প্রবেশ করে, বিদেশীয় ভাষা সেরূপ করিতে পারে না, মাতৃ ভাষায় হৃদয়ের ভাব যত প্রকাশিত হয়, বিদেশীয় ভাষায় সেরূপ কখনই হয় না। হৃদয়ের উন্নত ভাব সকলের বিনিময়ই কোন জাতি-সাধারণকে উন্নত করিবার প্রধান উপায়; সে উপায় সর্ব্বতোভাবে মাতৃভাষা সাপেক্ষ। জন্মভূমির জল বায়ুর সঙ্গে মানুষের দেহের যেরূপ সম্বন্ধ, মাতৃভাষার সঙ্গে মানুষের অন্তঃপ্রকৃতির সেইরূপ সম্বন্ধ। রণে বনে শ্মশানে ও সূতিকাগারে যে ভাষা আমাদিগের শ্রুতি-মূলে

প্রবেশ করে, বোগ শোক উৎসব ও আমোদে আমরা যে ভাষা ব্যবহার করি, সে ভাষাকে যদি আমরা উন্নত চিন্তা, বিশুদ্ধ ভাব ও বাগ্মীতায় বিভূষিত করিতে পারি, তাঁহাহইলেই জাতীয় চরিত্র গঠনেব মহৎ উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে।

মাতৃভাষায় ইতিহাসের বহুল প্রচাব আবশ্যক। যে ইতিহাস জগতের ঘটনা সকলের যথাযথ বর্ণনা করিয়া পুরাতন কালকে বর্ত্তমানেব ন্যায় চক্ষুসমক্ষে উপস্থিত করে; যে ইতিহাস বিভিন্ন রাজ্যের ও বিভিন্ন কালের আচার ব্যবহাব ও রীতি নীতির তুলনা করে; যে ইতিহাস পাঠে মানুষের মন রাজনীতি ও সমাজ-নীতির আলোচনায় উৎসুক হয়, এবং মনুষ্যবুদ্ধি সমাজতত্বের জটিল প্রশ্ন সকলের মীমাংসা কবিতে সক্ষম হয়; যে ইতিহাস স্বেচ্ছাচাব ও ব্যক্তিগত অসীম ক্ষমতাব বিষময় পরিণাম প্রদর্শন কবিয়া সাধারণ মতেব মাহাত্ম্য প্রচাব করে; যে ইতিহাস স্বদেশ-হিতৈষীদিগেব আত্ম-নিগ্রহ, ধর্ম্মবীবদিগের ত্যাগস্বীকার ও যুদ্ধবীবদিগেব জ্বলন্ত উৎসাহ কীর্ত্তন করিয়া মনুষ্যেব হৃদয় মনকে জাগ্রত ও উত্তেজিত করে; সেই রূপ ইতিহাসই জাতীয় সাহিত্যের ভিত্তি স্বরূপ। এইরূপ ইতিহাসের অভিজ্ঞতা লইয়া দর্শন এবং এইরূপ ইতিহাসেব ঘটনা লইয়াই কাব্যের সৃষ্টি। জাতীয় চরিত্র উন্নত কবিতে হইলে মাতৃ ভাষায় এরূপ ইতি-হাসের প্রচার ও অনুশীলন একান্ত কর্ত্তব্য।

মাতৃভাষায় কাব্য এবং দর্শনেরও বহুল প্রচার আবশ্যকীয়। দর্শনের অনুশীলনে মানুষের মন বিচক্ষণ হয়, মানুষেব চিন্তা-শক্তি মার্জ্জিত ও বিচার-শক্তি প্রখর হইয়া সত্যানুসন্ধানে প্রবৃত্ত ও অনুরক্ত হয়। জ্ঞান-তৃষ্ণাব বৃদ্ধি ও জ্ঞানলাভ দর্শনানুশীলনের অব্যর্থ ফল। গভীর মনীষাসম্পন্ন মহাপুরুষেরা যে সকল অধ্যাত্ম-তত্ত্বের আবিষ্কাব করেন, দর্শনের আকাবে তাহা জনসমাজে

প্রচারিত হয়। জ্ঞানীদিগের চিন্তা জনসাধারণে ব্যাপ্ত ও সংক্রামিত হইয়া সমাজের অজ্ঞতা ও অসহায়তা বিদূরীত হইতে থাকে। সেইরূপ আবার কাব্যের আলোচনায় মানব হৃদয়ের উৎকর্ষ জন্মে। যে সকল কাব্যে সত্য, ন্যায়, প্রীতি ও পবিত্রতার মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়, যাহা অধ্যয়ন করিলে সাহস সামর্থ্য, বিনয় ভক্তি, ত্যাগ স্বীকার ও স্বদেশানুরাগের উদ্রেক হয়; যাহা পাঠ কালে আনন্দ ও পরে সৎকার্য্যের জন্য চিত্তে আকাঙ্ক্ষা জন্মে; তাহার অনুশীলনেই মানব হৃদয় প্রকৃত উন্নতি লাভ করিতে পারে। জাতীয় সাহিত্যে এরূপ উৎকৃষ্ট কাব্যের ভূরি প্রচার প্রয়োজনীয়।

জাতীয় চরিত্র উন্নত করিবার অব্যর্থ উপায় জাতীয় সঙ্গীত। সৌন্দর্য্য যেমন মানুষের দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিয়া মানুষের হৃদয মনকে আপ্লুত করে, সুস্বরও সেইরূপ মানুষের শ্রুতিমূল অবলম্বন করিয়া মানুষের হৃদয় মনকে আলোড়িত করে। মানব হৃদয়ের স্তরে স্তরে এমন সহজে আর কিছুই প্রবেশ করিতে পারে না। জড় শরীরে বিদ্যুতগ্নি যেমন প্রবিষ্ট হয়, সুস্বরও লয়ের অন্তরালে লুক্কায়িত থাকিয়া, ভাবস্রোতও সেইরূপ মানব হৃদয়ে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া কার্য্য করে। প্রচারের এমন সহজ ও অব্যর্থ উপায় আর নাই। ক্ষমতাশালী প্রচারক তার-স্বরে চীৎকার করিয়া যত প্রচার করিতে না পারেন, একটী মাত্র উৎকৃষ্ট সঙ্গীতে তদপেক্ষা অধিক কার্য্য হইতে পারে। রাজ-প্রাসাদ হইতে ভিক্ষাশ্রম পর্য্যন্ত শত শত কণ্ঠে তাহা যুগপৎ উচ্চারিত হইয়া সমাজের হিত সাধন করিতে পারে। অতএব জাতীয় সঙ্গীতের উৎকর্ষ সাধন করা একান্ত কর্ত্তব্য। উৎকৃষ্ট সঙ্গীত দ্বারা জাতীয় কাব্যকে অলঙ্কৃত করিতে পারিলে; মাতৃ-ভাষায় ধর্ম্মভাব, স্বদেশানুরাগ, পবিত্র প্রেম ও বিশুদ্ধ রসের উত্তেজক সঙ্গীতের

বহুল প্রচার করিতে পারিলে জাতীয় চরিত্র উন্নত করিবার অতি মহৎ উপায় উদ্ভাবিত হইতে পারে।

জাতীয় চরিত্র উন্নত করিতে হইলে জাতীয় রীতি নীতি, আহার ব্যবহার এবং ক্রীড়া কৌতুকেরও উৎকর্ষ সাধন আবশ্যক। কথিত আছে, মহাত্মা লাইকারগাসের শাসন সময়ে স্পার্টানগরে যে সকল যুবাপুরুষ রাজ্য সম্বন্ধীয় কার্য্যের জন্য শিক্ষিত হইত, তাহারা সকলে একাসনে একরূপ আহার করিত; এবং আহার সময়ে যে সকল গুপ্ত উপদেশ লাভ করিত, তাহা কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে পারিত না। এইরূপে তাহারা একদিকে মিত-ভোজী হইয়া সুস্থ ও সবল হইত, অপরদিকে তৎকাল-প্রচলিত রাজনীতির প্রধান অঙ্গ মন্ত্রগুপ্তি অভ্যাস করিত। শিখগুরু মহাত্মা গোবিন্দসিংহ তাঁহার অনুচরদিগকে অক্লিপ্ত-কেশ থাকিতে ও ধূমপান পরিত্যাগ করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। তাঁহার সমকালে শিখেরা কেশ শ্মশ্রুর পারিপাট্য সাধনে বড়ই অনুরক্ত ছিল। সেই বিলাসিতা বা ধূমপানের অনুরোধে উপস্থিত বিপদ নিবারণ কালেও পাছে ইঙ্গিতমাত্রে যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ করিতে না পারে, এই আশঙ্কাই এরূপ উপদেশের কারণ। গোবিন্দ সিংহের দূরদর্শী শিক্ষা প্রভাবেই শিখ সম্প্রদায় এক কালে ক্ষিপ্ত শার্দ্দূল-যূথের মত উত্থিত হইয়াছিল, এবং মোগল সম্রাটের দুর্দ্ধর্ষ ক্ষমতাকেও উপেক্ষা করিতে পারিয়াছিল।

তাস পাশকাদি দ্যুতক্রীড়া আলস্য ও অপদার্থতার প্রতি-নিধি স্বরূপ। রুগ্ন হইলে অথবা প্রতিকূল অবস্থায় পড়িলেই কেবল তাদৃশ ব্যসন মস্তিষ্কের উষ্ণতা হরণ বা অতিনিদ্রা নিবারণ পক্ষে ব্যবহার্য্য হইতে পারে। অশ্বচালনা, গুটিকাক্ষেপণ ও বিশুদ্ধ অঙ্গিরাদি শারীরিক স্বাস্থ্য ও মানসিক স্ফূর্ত্তি প্রদান করে। এ সকল বিশুদ্ধ ও মানুষোচিত ক্রীড়া ও আমোদই ভদ্র

ব্যক্তির সম্ভোগ্য। শিশু-বিবাহাদি যে সকল অনুষ্ঠানে সামাজিক পবিত্রতা বিনাশ করে, রোগ শোক দরিদ্রতা ও অকালপক্কতার সৃষ্টি করে, তাহার সংস্কার হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। সূক্ষ্ম-বস্ত্র-পরিহিত ক্ষীণযষ্টিধারী বাঙ্গালী "বাবু" যখন তাম্বূল-চর্ব্বিত রঞ্জিত মুখে অলিন্দে বসিয়া অবলার অঞ্চল বায়ু সেবন করেন, এবং অশ্লীল পরিহাস-পটুতা প্রদর্শন করিয়া স্বকীয় চরিত্রের জঘন্যতা প্রদর্শন করেন, তখন তাহাকে সৃষ্টির অপকৃষ্ট পদার্থ মনে করিয়া শত শত ধিক্কার দিতে ইচ্ছা হয়। এরূপ অপদার্থ মনুষ্য, এরূপ অস্বাভাবিক শিক্ষা, এরূপ নির্লজ্জ রীতি ও এইরূপ জঘন্য ব্যবহার যত কাল কোন দেশ হইতে বিলুপ্ত না হয়, ততকাল তাহার অভ্যুদয় সুদূর-পরাহত। জাতীয় আহার ব্যবহার ও রীতি নীতি দ্বারা শরীরের বল, মনের স্ফূর্ত্তি, এবং হৃদয়ের পবিত্রতা সাধিত না হইলে উহা কাপুরুষতা ও কলঙ্কই উৎপাদন করিয়া থাকে।

জাতিসাধারণের মধ্যে ধর্ম্মের প্রভাব প্রতিষ্ঠিত না হইলে, জাতীয় চরিত্র উন্নত হইতে পারে না। মানুষের পারিবারিক ও সামাজিক অনুষ্ঠান, নৈতিক ব্যবহার ও পারলৌকিক প্রত্যাশা ধর্ম্মবিশ্বাসের উপরে সংস্থাপিত। অতএব ধর্ম্মবিশ্বাস বিশুদ্ধ না হইলে লোকের ব্যবহার হীন হইয়া থাকে, আর ধর্ম্ম বিশ্বাসের দৃঢ়তা না থাকিলে চরিত্রে শিথিলতা জন্মে। যেরূপ ধর্ম্মভাব মানব প্রকৃতির স্বাভাবিকতার উপরে প্রতিষ্ঠিত, যাহাতে স্বাধীন চিন্তার সহায়তা করে, যাহাতে জ্ঞান প্রীতি ও পবিত্রতা সম্বর্দ্ধিত করিয়া মানব চরিত্রে দেবভাব আনয়ন করে, তাহাই বিশুদ্ধ ও প্রার্থনীয়। যাহা অনুচিত অধ্যাত্মিকতা শিক্ষা দিয়া মানুষকে কল্পনার দাস করে, অথবা যাহা কেবল বাহ্য সম্পদ কামনা করিতে শিক্ষাদিয়া মানুষের অন্তঃপ্রকৃতিকে হীন

ও জীবনের আদর্শকে খর্ব্ব করে, যাহা প্রেমিকতার নামে ভাবুকতা ও স্বেচ্ছাচারের প্রশ্রয় দান করে, যাহা সদ্‌জ্ঞানের নামে সংশয়বাদ অথবা বৈরাগ্যের নামে আলস্য বা অসভ্যতা শিক্ষা দেয়, তাদৃশ ধর্ম্ম জাতীয় চরিত্র গঠনের অতি গুরুতর পরিপন্থী।

জাতীয় পরাধীনতা জাতীয় চরিত্র গঠনের অতি গুরুতর অন্তরায়। যাহাকে পরের ইচ্ছায় পরিচালিত হইতে হয়, পরের মুখাপেক্ষা করিয়া সৎকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও পরের ভয়ে দুষ্কার্য্যে নিবৃত্ত থাকিতে হয়, কর্ত্তব্য কাহাকে বলে তাহা সে জানে না; কর্ত্তব্যজ্ঞান ক্রমে তাহার বিলুপ্ত হইতে থাকে। পরাধীন জাতি কতকগুলি জাতীয় কর্ত্তব্য-ভার হইতে বঞ্চিত থাকে। দায়িত্বই চরিত্রের সর্ব্বোৎকৃষ্ট পরীক্ষাস্থল, সুতরাং চরিত্র-গঠনের প্রশস্ত উপায়।

পরাধীনতার মত দুঃখ মানুষের আর কি আছে। পরাধীনতার মত জাতীয় রোগ আর কি আছে! রুগ্ন দেহে সামর্থ্য ও স্ফূর্ত্তি বিধান করা যত ক্লেশকর, পরাধীন জাতির চরিত্রে বল ও সৌন্দর্য্য প্রদান করাও সেইরূপ দুরূহ। মানুষের স্বাধীন চিন্তা কার্য্যে পরিণত না হইলে হৃদয়ে বল জন্মে না; হৃদয় মনে সামঞ্জস্য না থাকিলে মানুষের চরিত্র গঠিত হয় না। যে জীবন কেবল সহনশীল, কার্য্যশীল নহে; সে জীবন জীবনই নহে। ক্রীতদাসেরা যেমন সর্ব্ব বিষয়ে প্রভুর সম্পত্তি ও কাষ্ঠ-লোষ্ট্রবৎ অসহায়, সামাজিক স্বাধীনতার অভাবে অবলাগণ যেমন সমাজের গলগ্রহ, জাতীয় স্বাধীনতার অভাবে পরাধীন জাতিও অনেক বিষয়ে সেইরূপ নির্জ্জীব ও নিস্পন্দ। এরূপ জীবনে শক্তি ও সৌন্দর্য্য লাভ করা দূরে থাকুক, উহা বিবিধ বিড়ম্বনায়ই পর্য্যবসিত হয়। বৃক্ষতলে বৃক্ষ যেমন ম্রিয়মাণ হইয়া থাকে, পর্য্যাপ্ত বায়ু ও সূর্য্যরশ্মির মুখাবলোকন করিতে পারে

না, পরাধীন জাতিও সেইরূপ সহজে উন্নতি বা সুখের মুখ দেখিতে পায় না। জাতীয় পরাধীনতা বিধাতার জাজ্জ্বল্যমান অভিসম্পাৎ স্বরূপ। জন্মভূমির অন্নজলে প্রতিপালিত হইয়া সেই মাতৃভূমির রক্ষা বা মঙ্গলার্থে শরীরের রক্তবিন্দু দান করিতে যাহারা কুণ্ঠিত হয়, তাদৃশ অকৃতজ্ঞ জাতিই এই অভিসম্পাতের ফল ভোগ করে, এবং চরিত্রে বল ও সৌন্দর্য্য বিহীন হইয়া নর-দেহে পশু জীবন যাপন করিতে থাকে।

কবিগুরু বাল্মীকি।

ইতিহাস অতীত ঘটনার সাক্ষী ও পুরাতন কালের প্রতিনিধি স্বরূপ। যাঁহারা ভূমণ্ডলে ক্ষমতা ও চরিত্রের বলে স্মরণীয় হন, যাঁহারা সমাজশক্তির নেমিরূপে জাতিবিশেষ বা দেশ বিশেষের অদৃষ্ট লইয়া অভিনয় করেন, সামাজিক আন্দোলনের প্রসঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে ইতিহাস সেই মহাপুরুষদিগের জীবন চরিত কীর্ত্তন করে। ইতিহাসের পত্রের সঙ্গে সঙ্গে যুগযুগান্তরের দ্বার উদ্ঘাটন করিয়া আমরা যাহা জড় নেত্রে দেখিতে না পাই, মনশ্চক্ষুতে তাহা প্রত্যক্ষ করি, এবং এইরূপে ভূত ও বর্ত্তমানে তুলনা করিয়া ভবিষ্যতের কর্ত্তব্য নিরূপণে সমর্থ হই। ইতিহাসের আর এক অনির্ব্বচনীয় উপকারিতা এই যে, নিতান্ত অধঃপতিত জাতিও ইতিহাসের মুখে স্বকীয় অতীত কীর্ত্তির আখ্যান শুনিয়া পূর্ব্ব গৌরবের পুনরুদ্ধারে সযত্ন হইয়া থাকে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে ভারতের প্রাচীন ইতিবৃত্ত নাই। যে দেশে ধর্ম্ম শাস্ত্র, দর্শন শাস্ত্র ও ব্যবহার শাস্ত্রাদির বিপুল চর্চ্চা হইয়াছিল, সেই অতি পুরাতন সভ্যদেশের প্রকৃত ইতিহাস নাই। বৈদেশিক জেতাদিগের বিদ্বেষ-বিদূষিত ব্যবহারও ইহার এক কারণ; কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দিগের অনুচিত আধ্যাত্মিকতা ও

কল্পনা-প্রিয়তাই ইহার গুরুতর কারণ। পুরাতন ভারতের প্রকৃত ঘটনাও এরূপ উৎকট কল্পনার আবরণে আবৃত হইয়া রহিয়াছে যে, প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করা সুদূরপরাহত। ইদানীন্তন উন্নত জাতি সকলের মধ্যে অতি সামান্য সামাজিক ঘটনার ইতিবৃত্ত, অতি সামান্য মনীষা সম্পন্ন লোকেরও জীবন-চরিত লিখিত হইতেছে; আর প্রাচীন ভারতের কত কত অসাধারণ মহাপুরুষের নাম মাত্রের উল্লেখ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়; আর কত কত সামাজিক মহা বিপ্লবই বা যথার্থ বিবরণের অভাবে অকিঞ্চিৎকর উপকথায় পরিণত হইয়াছে।

যিনি কবিতার প্রথম প্রসবিতা, স্বভাবের সহোদর ও করুণ রসের অবতার স্বরূপ, ভারতের ভাগ্য দোষে সেই বাল্মীকির জীবন-চরিত নাই। যে বাল্মীকি ভাবের আগ্নেয় গিরি স্বরূপ, যাঁহার রচিত মহাকাব্য জগতের ইতিহাসের এক পর্ব্ব স্বরূপ যাঁহার অভ্যুদয়ে সংসারে এক অলৌকিক সৌন্দর্য্যের প্রচার হইয়াছে, সেই বাল্মীকির জীবন-চরিত নাই। সেই বাল্মীকি কাহার সন্তান, কোথায় জন্মিলেন, কিরূপে বিদ্যাভ্যাস করিলেন কোন্ দিন কত বয়সে রামায়ণের অমৃতময় লেখনী প্রথম চালন করিলেন, কবেইবা সেই অপূর্ব্ব গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠা লিখিত হইল, বাল্মীকি-জীবনের শেষ ভাগ কিরূপে অতিবাহিত হইল—এসকল প্রশ্ন কাহার মনে উপস্থিত না হয়? কিন্তু হায়, যাহার মনেই উপস্থিত হয়, কল্পনা রাক্ষসী পুরাতন কালের দ্বারদেশে অগ্রসর হইয়া তাহাকেই ভ্রূকুটি করে, তাহাকেই তথ্য লাভে বঞ্চিত করে।

লোকপ্রসিদ্ধ এই যে, বাল্মীকি রত্নাকর নামে এক দস্যু ছিলেন। উক্ত নামধেয় কোন দুর্দান্ত পাষণ্ড ব্রাহ্মণ-কুমার পথ প্রান্তে শত শত নরহত্যা করিয়া দেবতাদিগেরও চিন্তার কারণ হইয়াছিল। এইরূপ দুর্দ্ধর্ষ দস্যুবৃত্তি দ্বারা সে পরিবার প্রতিপালন

করিত। একদা দেবর্ষি নারদ ও ব্রহ্মা একযোগে তাহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে স্বকৃত দুষ্কর্ম্মের অপকারিতা বুঝাইয়া দেন, এবং রাম নাম জপ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিবার উপদেশ প্রদান করেন। বহু সহস্র বর্ষ তপস্যা করিয়া বাল্মীকির পাপ খণ্ডন ও কাব্য-শক্তি লাভ হয়। এক স্থানে অনড়ভাবে এত দীর্ঘকাল তপস্যায় উপবিষ্ট ছিলেন যে, তাহার সর্ব্বাঙ্গ বল্মীকে পরিণত হইয়াছিল, ইহা হইতেই তাহার নাম বাল্মীকি হইয়াছে। এই পুরাণোক্তি যে কল্পনার অভিনয়ে পরিপূর্ণ, তাহাতে আর সন্দেহ নাই। এই উপাখ্যান দ্বারা রামচরিত্রের উৎকর্ষ সাধন ও রাম নামের মাহাত্ম্য বর্ণন পরিপাটিরূপে হইয়াছে বটে, কিন্তু মানুষের মার্জ্জিত বিশ্বাস ইহা গ্রাহ্য করিতে পারে না। অতএব দীর্ঘ-নিশ্বাস সহকারে বলিতে হইবে, আমরা বাল্মীকির জীবন-চরিত কিছুই জানি না!

জনসমাজে কবির অসাধারণ প্রভাব। বৈজ্ঞানিক যেমন পার্থিব উন্নতির পথ পরিষ্কার করিয়া জগতে বাহ্য সম্পদের সূচনা করেন, দার্শনিক যেমন অধ্যাত্মতত্ত্বের জটিলতা ভেদ করিয়া জনসমাজের মানসিক সৌন্দর্য্য ও সামর্থ্যের সৃষ্টি করেন, কবিও সেইরূপ মানব হৃদয়ের উৎকর্ষ সাধন করিয়া জাতীয় চরিত্র গঠন করেন। বিজ্ঞান পর্ব্বতের পাষাণময় দেহ বিদীর্ণ করিয়া, বিদ্যুতের স্কন্ধে ভর করিয়া মানুষের সৌকর্য্য সাধন করে, দর্শন জ্ঞানালোক বিকীর্ণ করিয়া মনুষ্যকে দিব্য চক্ষু প্রদান করে, আর প্রকৃত কাব্য অন্তঃসলিলা স্রোতস্বতীর মত সমাজকে সজীব রাখে, এবং আপনার পবিত্র প্রবাহে সমাজের পাপরাশি বিধৌত করে। প্রকৃত কাব্যের কার্য্য মানব হৃদয়ে প্রেম, সহিষ্ণুতা, সৎসাহস ও পবিত্রতা প্রদান করা। পৃথিবীতে যথার্থ কাব্য-শক্তি লাভ করা কি দেবদুর্লভ সৌভাগ্য! কবি

বিরলে বসিয়া আপনার চিন্তা-রেখাতে হৃদয়ের ভাবের বিচিত্র বর্ণ যোজনা করিলেন, সেই চিত্র নানা বর্ণে সঞ্জীবিত করিলেন, আর যেখানে কিছুই ছিল না, সেই মরুভূমিতে নন্দন কাননের উদ্ভব হইল; জগতের লোক সেই দৃশ্য দর্শনে মুগ্ধ ও সেই সৌন্দর্য্যের স্বাদ গ্রহণ করিয়া চরিতার্থ হইল, প্রকৃত ঘটনা বিস্মৃত হইয়া মানব সমাজ সেই অদ্ভুত-পূর্ব্ব দৃশ্যের মায়ায় মুগ্ধ হইল, এবং তাহারই সুখ দুঃখের ভাগী হইয়া হর্ষ বিষাদে আকুল হইতে লাগিল। বিস্তৃত সমুদ্র-বক্ষে একটুকু জলস্ফীতি ঘটিলে যেমন ক্রমে ক্রমে সমস্ত সাগরপৃষ্ঠ আলোড়িত হয়, কবি-হৃদয়োদ্ভূত একটী ভাব সেইরূপ সমগ্র সমাজকে আন্দোলিত করে। কবি-হৃদয়ের একটী দীর্ঘ-নিশ্বাস কালক্রমে মানব সমাজে এক মহাবাত্যা উপস্থিত করে। কবি-হৃদয়ের একটী আবেগ ঘোরতর স্বার্থপর এবং পর-পদ-প্রয়াসীরও হৃদয়কে স্পর্শ করে, এবং কালক্রমে তদ্দ্বারাই অভাবনীয় সমাজ-বিপ্লব সংঘঠন করে। কাব্য-শক্তির তুলনা নাই, কবির মত উপদেষ্টা নাই, মানুষের হৃদয়ের অন্তস্তল ও মনুষ্য-স্বভাবের মূলদেশ কাব্য ভিন্ন আর কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারে না। পুণ্যের পুরস্কার ও পাপের লাঞ্ছনার কত উপদেশ ধর্ম্মশাস্ত্রে রহিয়াছে, কে তাহা স্মরণ করে? কিন্তু কবির হস্তে দশাননের দুর্দ্দশার চিত্র দেখিয়া ভুভাবতে কে না পাপের প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে, দুষ্কৃতির দণ্ড-ভয়ে ভীত হয়? তুমি শত শত বার সতীধর্ম্মের মাহাত্ম্য বর্ণন করিয়াও হয়তো আমার মন আকর্ষণ করিতে পারিবে না, কিন্তু যদি একটী সীতা চরিত্র অঙ্কিত করিয়া আমার চক্ষের উপর ধরিতে পার, আমার পাষণ্ড হৃদয় নিশ্চয়ই পরাস্ত হইবে; এবং তোমারও পরিশ্রম সার্থক হইবে। অলৌকিক সৌন্দর্য্যের স্রষ্টা বলিয়া ত কবির আদরের সীমা নাই, কিন্তু শ্রেষ্ঠতম উপদেষ্টা বলিয়াও কবি জগতের নমস্য।

এই জন্য আমরা প্রকৃত কবির এত পক্ষপাতী, এই জন্য কবি-গুরু বাল্মীকির নাম করিতে আমাদিগের অন্তরে অজস্র শ্রদ্ধার উদ্রেক হয়। এই জন্য আমরা কবিচরিত্র বর্ণনের ও কবির জীবন-চরিত রক্ষণের এত আকাঙ্ক্ষা করি। কিন্তু হায়, কবিগুরু বাল্মীকির জীবন অন্ধকারে বিলীন; বাল্মীকির জীবনের আমরা কিছুই জানি না।

বাল্মীকির জীবন-চরিত আমরা কিছু জানি না বটে, কিন্তু বাল্মীকি হৃদয়ের মহত্ত্ব আমরা অবগত আছি। রামায়ণরূপ মহামুকুরে বাল্মীকির স্বর্গীয় হৃদয় প্রতিফলিত হইয়াছে। ভূ-মণ্ডলে রামায়ণের মত এমন সুন্দর কাব্য আর নাই, বাল্মীকি-হৃদয়েরও সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। জনসমাজ সেই সৌন্দর্য্য বহু শতাব্দী অবলোকন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছে। জ্ঞান চর্চ্চার সঙ্গে সঙ্গে, ভাষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সে সৌন্দর্য্যের মর্য্যাদা দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। এক কালে জগতের ঘরে ঘরে বাল্মীকির নাম পূজিত হইবে।

শ্রেষ্ঠ কাব্য কাহাকে বলে? যাহাতে অসাধারণত্ব আছে, অথচ অস্বাভাবিকতা নাই, তাহাই শ্রেষ্ঠ কাব্য। রামায়ণ স্বাভাবিকতার প্রতিকৃতি স্বরূপ। স্বভাব ও সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব সম্মিলনে রামায়ণের জন্ম। সরলতা ও ভাব যেন মূর্ত্তিমান হইয়া রামায়ণের মধ্যে ক্রীড়া করিতেছে। নিরর্থক বাক্ চাতুরি, ভাব-শূন্য ভাষা বাল্মীকির লেখনী হইতে বিনির্গত হইতে পারে নাই। অপত্যস্নেহ, দাম্পত্য-প্রেম, বীর-পরাক্রম কি বৈরাগ্য, এ সকলই অতি উজ্জ্বলরূপে অথচ সরল ভাষায় বাল্মীকি চিত্রিত করিয়াছেন। যে কাব্যে কল্পনা সকল সৌন্দর্য্য বিহীন, তাহা কাব্যই নহে, কেননা তাহাতে মানুষের মন আকৃষ্ট হয় না। আবার যাহার কল্পনা গুলি উৎকট বা অস্বাভাবিক, তাহাও কাব্য নহে,

কেননা তাহাতে মানব হৃদয় স্পর্শ করিতে পারে না। রামায়ণের প্রতি চরিত্রের সৌন্দর্য্য অননুভবনীয়, অথচ উহার কিছুই অবিশ্বাস যোগ্য নহে। কি আশ্চর্য্য কাব্য শক্তি! যে ব্যক্তি রামায়ণ পাঠ করিবে, সেই যেন মনুষ্য লোক বিস্মৃত হইয়া দেব চরিত্র অধ্যয়ন করিতেছে, এই মনে করিবে; অথচ আপনাকে সেই দেব পরিবারের এক ব্যক্তি মনে করিয়া তাঁহাদিগের সুখ দুঃখে হাস্য ও ক্রন্দন করিতে থাকিবে। কবির কি আশ্চর্য্য দৈব-শক্তি, পাঠকের হৃদয়ে এক দিকে ভাব ও বিস্ময় রসের তরঙ্গ উঠিতে থাকিবে, অথচ প্রকৃত ঘটনার অভিনয় দেখিতেছি বলিয়া মনে হইবে, অবিশ্বাসের আভাসও উদ্রিক্ত হইবে না।

রামায়ণ প্রীতি, পবিত্রতাও পরাক্রমের অধিষ্ঠান ভূমি। বিভিন্ন প্রকারে ভিন্ন ভিন্ন চরিত্রে এই তিন ভাব পরিব্যক্ত হইয়াছে। কোন চরিত্রে অপত্যস্নেহ, কোন চরিত্রে দাম্পত্য-প্রেম, কোন চরিত্রে ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, কোন চরিত্রে ত্যাগ-স্বীকার, কোন চরিত্রে ভ্রাতৃভাব, কোন চরিত্রে প্রভু-ভক্তি, আর কোন চরিত্রে বা পরাক্রমের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। এক গ্রন্থে,এক উপাখ্যানে এরূপ বিবিধ ভাব ও এরূপ বিবিধ রসের সমাবেশ আর কোথায় আছে? বাল্মীকি-হৃদয় সৌন্দর্য্যের অনন্ত প্রতিকৃতি স্বরূপ। যদি কেহ বাল্মীকি-হৃদয়ের সুগভীর অপত্যস্নেহ অনুভব করিতে চায়, তবে সে কৌশল্যার কাতর মূর্ত্তি নিরীক্ষণ করুক, দশরথের শোক-মৃত্যু স্মরণ করুক। অপত্যার্থে দেবসেবা ও দীর্ঘকালের তপস্যা, তার পর রাম বনবাসের উদ্যোগে কৌশল্যার কাতরতা, তাড়কা-সংগ্রামে প্রেরণ করিয়া রাজ-দম্পতীর উৎকণ্ঠা, পুত্রকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্যোগে আনন্দ ও বনগত পুত্রের বিরহে দশরথের জীবলীলা সম্বরণ যেন অপত্য-

স্নেহের প্রত্যক্ষ লীলাখেলা সদৃশ। ইহা অপেক্ষা বাৎসল্য রসের সুন্দর চিত্র আর কি হইতে পারে!

বাল্মীকি হৃদয়ের দাম্পত্য প্রেম অকলঙ্ক সীতা-মূর্ত্তিতে পরিব্যক্ত হইয়াছে। প্রীতি এবং পবিত্রতার সম্মিলনে সতীত্বের উৎপত্তি; সতীত্ব এবং সীতা, এই দুই কথায় কি প্রভেদ আছে? জগতে সীতা চরিত্রের কি উপমা আছে? যে দেশের রমণী সমাজে এইরূপ এক সীতার জন্ম হয়, যুগ যুগান্তর পর্য্যন্ত সে দেশের পুণ্যের ভাণ্ডার অক্ষয় হইয়া থাকে। রাজনন্দিনী,রাজবধূ হইয়া সীতা বনবাসে পতির অনুগামিনী হইলেন। যিনি অট্টালিকায় রত্ন-খচিত সুখশয্যায় লালিত পালিত, পতি-বিচ্ছেদ ভয়ে তিনি একদিন দুই দিনের জন্য নয়, চতুর্দ্দশ বৎসরের জন্য, হয়তো ইহ জীবনের জন্য, বল্কল পরিধানে অরণ্য ভ্রমণ স্বীকার করিলেন, রাজলক্ষ্মী বন-চারিণী হইলেন, দুঃখ, পরিশ্রম বা ভয়ের প্রতি দৃক্‌পাতও করিলেন না! পতি-সহবাসে পতি-মুখ নিরীক্ষণ করিয়া বনবাস-ক্লেশ উপেক্ষা করিলেন, এক দিনের তরেও বিষণ্ণবদন হইলেন না। আবার যে সীতা পতি-সহবাস লালসায় রাজপুরী পরিত্যাগ করিয়াছিলেন, যিনি চতুর্দ্দশ বর্ষ অক্ষুণ্ণ হৃদয়ে পতিসহ বনবাস-ক্লেশ স্বীকার করিলেন, আর সেই বনবাসে দস্যু কর্ত্তৃক অপহৃতা হইয়া লাঞ্ছনার এক শেষ ভোগ করিলেন, পতির মুখাপেক্ষা করিয়া জীবন উৎসর্গ করিলেন; সেই সীতা যখন সুখের সময়ে, এত দুঃখ বিড়ম্বনার পর পতির ভাগ্য প্রসন্ন হইবার সময়ে, নিরপরাধে অবিচারে সেই জীবনসর্ব্বস্ব পতি কর্ত্তৃক পরিত্যক্তা হইলেন, তখনও তিনি স্বামীর অমঙ্গল কামনা বা পতিনিন্দা করিলেন না; কেবল আপনার অদৃষ্টকে ধিক্কার করিলেন এবং আত্ম-বিস্মৃত হইয়া আপনার বিরহে পতির যে ক্লেশ হইবে সেই চিন্তা করিয়া আকুলপ্রাণা

হইলেন! ইহা অপেক্ষা দাম্পত্য প্রেমের মধুর চিত্র আর কি সুন্দর হইতে পারে?

স্থূলদর্শী লোকেরা সীতার অগ্নি-পরীক্ষাকে সীতা চরিত্রের শ্রেষ্ঠতার প্রধান পরিচয় মনে করে। প্রীতি ও পবিত্রতার আকর-রূপিণী সীতার চরিত্রের পরীক্ষা অনলে আর কি হইবে? সীতা-চরিত্রের প্রকৃত অগ্নিপরীক্ষা সীতা উদ্ধারের পরে হয় নাই; সে পরীক্ষা রাক্ষসের পুরীতে অশোক বনেই হইয়াছিল। যখন রাক্ষসের দুরন্ত পরিচারিকারা খড়্গহস্তে সীতাকে তাড়না করিত, যখন ভুবন-বিজয়ী দশানন রত্ন-সজ্জায় সুসজ্জিত হইয়া লঙ্কার সিংহাসন সীতার চরণে উৎসর্গ করিবার জন্য মিনতি করিত, তখন সীতা চরিত্রের প্রকৃত অগ্নি-পরীক্ষা হইত। এক দিকে প্রাণের ভয়, অপর দিকে অতুল পার্থিব সুখের প্রলোভন, কি ভয়ানক পরীক্ষা! যাঁহারা মানব প্রকৃতি পর্য্যালোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা জানেন, ভয় অপেক্ষা প্রলোভনের কত অধিক শক্তি। মহাভয় যাহাকে বিচলিত করিতে পারে না, প্রলোভন ক্রমে তাহাকে আয়ত্ত করিয়া বসে। যে বীর পুরুষ শত সহস্র অসি-ফলক আলিঙ্গন করিয়া আপনার রক্তে আপনি স্নাত হইলেও পরাস্ত হইতে চাহেন না, প্রতিপত্তি বা পদ-মর্য্যাদার সামান্য প্রলোভনে তাঁহাকে বিচলিত করিতে পারে। যে তপস্বী সংসার-সুখে জলাঞ্জলি দিয়া কঠোর তপস্যা করেন, যিনি পাষণ্ডের অত্যাচারে বা শ্বাপদের নখদন্তে ভীত হয়েন না, অবলার একটী মাত্র কোমল কটাক্ষে তাঁহাকে মেষ শাবকের মত অসহায় করিতে পারে। এ সংসারে প্রলোভনের মত আপদ আর নাই। যে সীতা বনবাসের অপার ক্লেশের পর দস্যুগৃহে শত্রুবর্গে পরিবেষ্টিত হইয়া ভয় এবং প্রলোভনে পুনঃ পুনঃ উত্তেজিত হইয়াও বিচলিত হয়েন নাই, পতি সহ পুনর্ম্মিলনে হতাশপ্রায় হইয়াও

যে সীতা অনাহারে অনিদ্রায় অশ্রুজল মাত্র সহায় করিয়া, পতির নাম উচ্চারণ করিয়া এবং পতিপ্রেমের স্মৃতি মাত্র অবলম্বন করিয়া অস্থে রক্ষা করিয়াছেন, তিনি সত্য সত্যই প্রেম ও পুণ্যের অবতার স্বরূপা। আর যে হৃদয় এরূপ চিত্র উৎপাদন করিয়াছে, তাঁহাও প্রেম পুণ্যের প্রস্রবণ স্বরূপ। ধন্য সীতার চরিত্র, ধন্য বাল্মীকি, আর ধন্য বাল্মীকি-হৃদযের প্রীতিপবিত্রতা!

রামায়ণের রামচরিত্র বাল্মীকি-হৃদয়ের ধর্ম্মনিষ্ঠার অদ্বিতীয় নিদর্শন স্বরূপ। ধর্ম্ম-নিষ্ঠা, ধর্ম্মানুমোদিত কর্ত্তব্য পালন কাহাকে বলে যদি কেহ জানিতে চায়, তাহার রামচরিত অধ্যয়ন করা আবশ্যক। রাজসিংহাসনে পদার্পণ করিতে উদ্যত হইয়া অকুণ্ঠিত চিত্তে রামচন্দ্র বন আশ্রয় করিলেন, স্বজন ও বন্ধু বান্ধবের উপরোধ শুনিলেন না, জননীর কাতর ক্রন্দনে বিচলিত হইলেন না,—কেন? স্বকীয় দুষ্কৃতির কোন প্রায়শ্চিত্ত জন্য নহে, সংসার-সম্ভোগে বিরক্ত হইয়া নহে; কিন্তু পিতৃবাক্য পালন না হইলে পিতা ধর্ম্মে পতিত হইবেন, এই আশঙ্কায়। ইহা অপেক্ষা ধর্ম্ম ভয় আর কি হইতে পারে? কিন্তু এখানেই রামচরিত্রের ধর্ম্ম-নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের সমাপ্তি নহে। বনবাসের নিদারুণ ক্লেশ সম্ভোগের পর যখন রামচন্দ্র আবার অযোধ্যার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলেন, যখন বহুঝঞ্ঝাবাতের পর আবার দশরথ-পুত্রের অদৃষ্ট-সূর্য্য ক্ষণকালের জন্য মৃদু মৃদু হাস্য করিতে লাগিল, তখন আবার অদৃশ্য ও অনন্ত নিবিড় জলদ-জালে আসিয়া তাহাকে চিরদিনের জন্য আবৃত করিল, রামচন্দ্রের জীবন অনন্ত অন্ধকারে নিমগ্ন হইল! ধর্ম্ম যেন নির্ম্মম রাক্ষসের বেশে আসিয়া দশরথাত্মজকে স্বীয় পরিচর্য্যায় আহ্বান করিলেন। যে জানকী রামচন্দ্রের জীবন-সর্ব্বস্ব ও হৃদয়ের গ্রন্থিরূপা, যে জানকী বনবাস

বাসক্লেশ-সহচরী, নয়নের পুত্তলি, প্রীতি এবং পবিত্রতার অকলঙ্ক প্রতিমাস্বরূপা, যে জানকী শত পরীক্ষায় পরীক্ষিতা ও সকল সুখের স্পর্শমণি স্বরূপা, সসত্ত্বাবস্থায়—অসহায় অবস্থায়, সন্তানের মুখাবলোকন করিবার আশায় অন্তরে যে অতুল আনন্দের অঙ্কুর জন্মিতেছিল, তাহারও মূল উৎপাটন করিয়া জানকীকে পরিত্যাগ করিলেন—কেন? রাজধর্ম্ম পালনের অনুরোধে। জগতের ইতিহাসে ইহা অপেক্ষা ধর্ম্মভাবের উৎকৃষ্ট উদাহরণ আর কোথায় আছে? জানকীকে পরিত্যাগ করিয়া রামচন্দ্রের জীবন দুঃখময় স্বপ্নে পরিণত হইয়াছিল। সীতাশোকে তিনি বিগলিত হইয়া গেলেন, অবলার মত ক্রন্দন করিলেন, অথচ ধর্ম্মভয়ে নিরেট পাষাণ-হৃদয় হইয়া সেই সীতার মমতা পরিহার করিলেন। যদি এই ঊনবিংশ শতাব্দির কোন জ্ঞানাভিমানী লোক সীতানির্ব্বাসন-কাণ্ডে রাম-চরিত্রকে অনুযোগ করে, তাহাকে অল্পদর্শী বলিতে হইবে, জগতের ইতিহাস সে ভাল করিয়া অধ্যয়ন করে নাই। রামচন্দ্রের বিচারশক্তির, রামচন্দ্রের সমকালে সমাজের বিচারশক্তির ভিন্ন মূর্ত্তি ছিল; তৎকালে সমাজের চিন্তাস্রোত ভিন্ন পথে প্রবাহিত হইত। তাহাতেই সীতানির্ব্বাসন কর্ত্তব্য হইয়াছিল। সীতা নির্ব্বাসনে কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণে ক্রটী হইয়াছিল, কর্ত্তব্য পালনে ক্রটী হয় নাই। যদি কিছু দোষ থাকে, সে দোষ রামচন্দ্রের মনের, রামচন্দ্রের হৃদয়ের নহে। আর যদি কেহ সীতাশোকে রামচন্দ্রের অবলাবৎ-ব্যাকুলতাকে উপহাস করে, নিশ্চয়ই মনে করিতে হইবে, সে ব্যক্তি অদ্যাপি মানব হৃদয়ের স্তরে স্তরে প্রবেশ করিতে পারে নাই, লোকচরিত্রে তাহার অভিজ্ঞতা যৎসামান্য। ধর্ম্ম বিশ্বাসের বলে মানুষ অতি দুর্দ্ধর্ষ কাণ্ডও সম্পাদন করিতে পারে; কিন্তু স্বভাবকে অতিক্রম করে কাহার সাধ্য? মানুষ বহু যত্নে স্বহস্তে

যাহা গঠন করে, কখনও বা স্বহস্তেই তাহা বিনষ্ট করে, আবার প্রকৃতিস্থ হইয়া স্বয়ং তাহার জন্য অশ্রুপাত করিতে বসে। অল্প বিশ্বাসী ও স্বার্থপর লোকেরা মানব-হৃদয়ের ভাবের এই বৈচিত্র উপলব্ধি করিতে পারে না।

বাল্মীকির লক্ষ্মণ ও ভরতের চরিত্র ভ্রাতৃভাব ও ত্যাগস্বীকারের অনুপম উদাহরণ। লক্ষ্মণ রাজপুত্র, বীর পুরুষ, গৃহে যুবতী ভার্য্যা, আপনি যুবক, মনে কত আশা—কতই সুখ, রাজপুত্র দূরে থাকুক, সে বয়সে দরিদ্রের পর্ণকুটীরে শয়ন করিয়াও লোক কত সুখের স্বপ্ন দেখিয়া থাকে। সেই বয়সে তিনি ভ্রাতৃপ্রেমে মুগ্ধ হইয়া সকল আশা বিসর্জ্জন করিয়া ভ্রাতার অনুগমন করিলেন, জটা-বল্কল পরিহিত বনবাসী হইলেন। জ্যেষ্ঠের অনুগমনে সীতা অপেক্ষা লক্ষ্মণের মহত্ত্ব অধিক। রণে বনে সকল সময়ে পতির অনুগমন করা পত্নীর কর্ত্তব্য, কিন্তু সকল অবস্থায় ভ্রাতার তাহা অবশ্য-কর্ত্তব্য নহে। ইহারই নাম ত্যাগস্বীকার, ইহারই নাম ভ্রাতৃভাব। কিন্তু বাল্মীকি হৃদয়ের স্বর্গীয় ভ্রাতৃভাব লক্ষ্মণ চরিত্রেই পর্য্যবসিত হয় নাই। ভরত-চরিত্রে তাহার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শিত হইয়াছে। বৈমাত্রেয় ভ্রাতার মুখের গ্রাস রাজসিংহাসন ও অতুল বৈভব হস্তে পাইয়া ধর্ম্মবীর ভরত কি করিলেন, না যাহারা তাঁহার সেই অযাচিত সম্পদের কারণ হইয়াছিল, তাহাদিগকে বিষদৃষ্টিতে দেখিতে লাগিলেন। ভ্রাতৃশোকে একেবারে আত্মবিস্মৃত হইয়া গেলেন; পিতৃপ্রদত্ত রাজসিংহাসন ভ্রাতার চরণে অর্পণ করিবার জন্য দীন বেশে ভ্রাতার অনুসন্ধানে বনগমন করিলেন। ইহা অপেক্ষা ভ্রাতৃভাব ও ত্যাগস্বীকার—আর কি হইতে পারে? এ সংসারে তুমি আমি স্বার্থপরতার ক্রীত দাস, আত্ম চিন্তাতেই নিমগ্ন, পুরীষের কৃমির মত অর্থসম্পদ সম্ভোগ করিয়া তাহাতেই প্রাণ পরিত্যাগ করি। আর দেখ

রাজপুত্রের ব্যবহার। আহা, বাল্মীকি হৃদয় কি গভীর ও উন্নত প্রেমের উৎস!

বাল্মীকি রচিত হনুমান প্রভুভক্তির জীবন্ত প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ। প্রভুর মঙ্গলাকাঙ্ক্ষা, প্রভুর আজ্ঞাপালন হনুমান-চরিত্রের অস্থি মাংস স্বরূপ। পর্ব্বত বহনে, সমুদ্র লঙ্ঘনে, সম্মুখ সংগ্রামে কি নির্জ্জন চিন্তনে হনুমানের প্রভুভক্তি একরূপ অটল। এরূপ সেবক পত্নী অপেক্ষা হিতৈষী, সহোদর অপেক্ষাও সহায় এবং পুত্র অপেক্ষাও প্রিয়তম। বাল্মীকি হৃদয়ে যে উপাস্য দেবতার প্রতি গভীর ও অচলা ভক্তি বিরাজিত ছিল, রামায়ণের হনুমান-চরিত্র তাহার প্রতিকৃতি স্বরূপ। এই ভক্তি অলস নহে, যেমন ভাবে তদ্গত, তেমনি কার্য্যে তৎপর। হনুমান ভক্তিভাব ও কার্য্যশীলতা শিক্ষার অদ্বিতীয় উপদেষ্টা। ইষ্টদেবে প্রীতি ও তদীয় প্রিয় কার্য্যসাধন হনুমান-চরিত্রের উপাদান স্বরূপ।

বাল্মীকির লব কুশ বীর-পরাক্রমের অবতার স্বরূপ। অস্ত্র চালনায় দক্ষতা বীরত্ব নহে, উহা শিক্ষাও অভ্যাসের ফল। সৈন্য সংস্থান-নিপুণতাও বীরত্ব নহে, উহাও বুদ্ধি সাপেক্ষ। বীরপরাক্রম স্বাভাবিক পদার্থ। পরাক্রম পাত্রাপাত্র কালাকাল ও বলাবল বিচার করিতে জানেনা। বিষধর যেমন পুচ্ছস্পর্শ করিলেই ঊর্দ্ধফণ হয়, বীরের স্বভাব সেইরূপ। ভ্রূকুটি, গ্লানি, অবিচার ও অত্যাচার বীরের পক্ষে সর্ব্বদা অসহনীয়। বিষয়নিপুণ দুর্ব্বল মনুষ্য অনেক সময়েই আপনার ভ্রান্ত বিজ্ঞতার অভিমান করিয়া বীর পুরুষকে হটকারী বা অবিবেচক মনে করিতে পারে; কিন্তু ~~বীর~~ তাহাকে কাপুরুষ মনে করেন। যখন দুর্ব্বৃত্ত দস্যুদল সতীর সতীত্বনাশে সমুদ্যত হয়, তখন আত্মবলের ন্যূনতা দেখিয়া নিরস্ত থাকা শৃগালের কার্য্য। জ্বলন্ত গৃহে অসহায় শিশুদিগের প্রাণহানি নিবারণ অসম্ভব বোধে যে উদাসীন থাকিতে পারে,

সে যার পর নাই কাপুরুষ, তাহার হৃদয় কাষ্ঠ লোষ্ট্রবৎ। স্বাভাবিক বীর-পরাক্রম আগ্নেয় গিরির অগ্ন্যুদ্গমের মত, প্রদীপ্ত অগ্নিশিখার মত। বাল্মীকির লব কুশ এইরূপ বীর্য্যের প্রত্যক্ষ প্রতিনিধি স্বরূপ। ধন্য বাল্মীকি হৃদয়ের বীরপরাক্রম!

আবার দেখ—বাল্মীকিহৃদয় অতুল স্বদেশানুরাগে পরিপূর্ণ। "জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী" এই মহাবাক্য বাল্মীকির হৃদয় হইতেই উত্থিত হইয়াছিল। এক কথায় এমন অনুপম স্বদেশানুরাগ আর কি প্রকাশিত হইতে পারে? ধন্য আর্য্যাবর্ত্ত, আর ধন্য বাল্মীকি! কিন্তু হায়, সেই বাল্মীকির জীবন চরিত নাই। যে বাল্মীকি স্বদেশানুরাগে ও বীরপরাক্রমে পরিপূর্ণ, যে বাল্মীকি অপত্যস্নেহের ও দাম্পত্য প্রেমের অনন্ত প্রস্রবণ স্বরূপ, যে বাল্মীকি ধর্ম্মনিষ্ঠা ও ত্যাগস্বীকারের অদ্বিতীয় উপদেষ্টা, আর যে বাল্মীকির হৃদয় ভগবদ্ভক্তি ও কর্ত্তব্য-জ্ঞানের অনন্ত ভাণ্ডার সম, যে বাল্মীকি অলৌকিক কাব্যশক্তির অবতার ও কবিতার প্রথম প্রসবিতা, সেই বাল্মীকির জীবন চরিত নাই। বাল্মীকির জীবন-চরিত নাই বটে, কিন্তু নিজকৃত কীর্ত্তি স্তম্ভে বাল্মীকি স্বকীয় হৃদয় আপনি খোদিত করিয়া রাখিয়া গিয়াছেন। চিরকাল জগতের ঘরে ঘরে বাল্মীকির নাম পূজিত হইবে।

স্মৃতির চমৎকারিতা।

শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের জীবনে কি পার্থক্য! যাহারা ঘড়িকাযন্ত্রের সময় নিরূপণের মত জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করে, আহার নিদ্রা ও সাংসারিক প্রয়োজন সাধন ভিন্ন যাহাদিগের আর চিন্তা করিবার কিছু নাই, যাহারা ভয় বিদ্বেষ ও ইতর আমোদ

প্রমোদ ভিন্ন আর কোন ভাব স্বপ্নেও উপলব্ধি করে না ; যাহাদিগের স্বাধীন চিন্তা নাই, যাহাদিগের হৃদয়ে নব নব ভাবের উদ্রেক হয় না, তাহারা মনুষ্য হইযা পশুলোকে অবস্থিতি করিতেছে। চিন্তাশীল ভাবুক ব্যক্তি সংসার-কার্য্যে ব্যাপৃত থাকেন বটে, কিন্তু তাঁহার অন্তর নির্লিপ্ত রাখিয়া তিনি সংসার সুখের অতিরিক্ত অতুল আনন্দ সম্ভোগ করেন। জগত যেমন তাহার বাহ্য প্রয়োজন সাধনের উপকরণ সমূহ প্রদান করে, তেমনই আবার অমৃতের ভাণ্ডার হইয়া তাঁহার অন্তঃপ্রকৃতির সম্ভোগের জন্য নিয়ত প্রস্তুত থাকে।

পূর্ণজ্ঞান ও আনন্দ স্বরূপ পরমেশ্বরের বিশ্বকার্য্য কি অদ্ভুত ব্যাপার। ভাবিলে চিন্তা পরাস্ত হইয়া যায়, হৃদয় ভাবে উদ্বেল হইয়া উঠে, বিস্ময় ও আনন্দ রসে অন্তঃকরণ পরিপ্লুত হইতে থাকে। সৃষ্টির সর্ব্বত্র কি অদ্ভুত কৌশল, কি অপরিসীম পারিপাট্য আর কি অনির্ব্বচনীয় সৌন্দর্য্য। যে দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ কর, বহির্জগতে কি অন্তর রাজ্যে, সর্ব্বত্রই চমৎকারিত্ব সৌন্দর্য্য ও সৌকর্য্য ওতঃপ্রোত হইয়া রহিয়াছে। যাহার চিন্তাশক্তি আছে ; এবং কুসংস্কারের শাসনে যাহার হৃদয় সঙ্কীর্ণতা-জালে আবদ্ধ নহে, সে ব্যক্তি যদি রজনীযোগে পরিষ্কার অন্তরীক্ষের দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করে, দূর দেশ-গামী বিহঙ্গ যেমন অদৃশ্য আকাশে উড়িয়া যায়, তাহার অন্তঃকরণও সেইরূপ মর্ত্ত্যভূমি অতিক্রম করিয়া অদৃশ্য রাজ্যে গমন করে, এবং ভাবও চিন্তার অনন্ত আবেশে আকুল হইয়া পড়ে। নীল নভোমণ্ডলে যে সকল জ্যোতিঃ খণ্ড ইতস্তত: বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে দেখিতে পাওযা যায়, উহা যে কি বিচিত্র পদার্থ এবং কি আশ্চর্য্য নিয়মে নিয়মিত, বৈজ্ঞানিক চক্ষু ভিন্ন চর্ম্মচক্ষুতে তাহা দেখিতে পারা যায় না। যে অতি সামান্য পদার্থ গগনবক্ষে অতি দূরে এক এক বার

ঈষৎ প্রজ্জলিত এবং খদ্যোৎপুঞ্জবৎ ঈষন্মিমিলিত হইতেছে, তাহাই যে আমাদিগের অধ্যুষিত ভূমণ্ডল অপেক্ষা সহস্র সহস্র গুণ বৃহত্তর ও অসীম বৈচিত্রে পরিপুর্ণ, মানুষের সহজ বুদ্ধি এ কথা কদাপি বিশ্বাস করিতে পাবে না। কিন্তু সত্য সত্যই ঐ পরিদৃশ্যমান নক্ষত্র মণ্ডলের প্রত্যেকে একটী সুর্য্য বা গ্রহ বা উপগ্রহ। এইরূপ কত সুর্য্য কত গ্রহ আর কত যে উপগ্রহ গগন-মার্গে বিরাজ করিতেছে কে বলিতে পাবে? অন্তরীক্ষে যে ধূসর বর্ণ ছায়াপথ দৃষ্ট হয়, উহা ঐরূপ অগণ্য নক্ষত্রপুঞ্জ বই আর কিছুই নহে। নক্ষত্রেব পর নক্ষত্র, দূবতার পব দূবতা ও সৌর-জগতের পর সৌরজগৎ, কোটী কোটী গ্রহ উপগ্রহ! তাব পর কি? তারপর আব মনুষ্যের দৃষ্টি চলে না, তার পর আব মানুষেব কল্পনা শক্তি যাইতে পাবে না; সৃষ্টিব প্রসার অনন্ত, সৃষ্ট পদার্থ অনন্ত, লোকবুদ্ধির গণনা ও মানব মনের ধারণাব বহির্ভূত। সৃষ্টি যদি অনন্ত না হইত তাহা হইলে মানুষের জ্ঞানোন্নতির পথ অব-রুদ্ধ হইত, মানবমনেব আলোচনার বিষয় পুরাতন হইয়া যাইত; মানুষের উন্নতি ও সুখের পথে কণ্ঠক পড়িত। এই অনন্তের চিন্তাতে মানুষের মন ক্রমে প্রশস্ত হইতে থাকে, অপার আশা ও বিস্ময় রসে মানুষের প্রাণ আকুল হয়।

বিশ্বস্রষ্টার কি অসীম জ্ঞানকৌশল। সেই কৌশলে এই অগণিত নক্ষত্র মণ্ডল এক দিকে নিরবলম্ব অপর দিকে অছেদ্য বন্ধনে সম্বন্ধ হইয়া শূন্যমার্গে দোলায়মান রহিয়াছে। উপগ্রহের সঙ্গে গ্রহের সম্বন্ধ, গ্রহের সঙ্গে সূর্য্যেব সম্বন্ধ, এক সৌরজগতের সঙ্গে অপর সৌরজগতের সম্বন্ধ; পবস্পব পরস্পরকে আকর্ষণ করে, পরস্পর পরস্পরকে প্রদক্ষিণ কবে। মানব বুদ্ধি এই বন্ধন রজ্জুর ঈষৎ পরিচয় পাইয়াছে; এই অসীম চক্রের কেন্দ্র কোথায়, মানুষ তাহা জানেনা। বর্ষেবর্ষে, দিনেদিনে, মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই

অনন্ত নক্ষত্রমালা, আকাশ পথে আবর্ত্তন ও পরিভ্রমণ করে। দ্রুতগামী বাষ্পীয় শকটের গতি তাহার তুলনায় কিছুই নহে। কেহবা পলকমধ্যে কল্পনার অতীত পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়া যায়; অথচ কেহ বিপর্য্যস্ত হয় না, কেহ কাহারও অঙ্গে ঘর্ষণ করে না, কাহারও গতি প্রতিহত হয় না। সপ্তের সঙ্গে পঞ্চের যোগ করিলে যেমন দ্বাদশ হয়, তাহারাও সেইরূপ অকাট্য নিয়মের অধীন হইয়া প্রতিনিয়ত কার্য্য করে। ধন্য সেই বিধাতা, যাঁহার অননুভবনীয় বিধিবশে এইরূপে জগৎকার্য্য নির্ব্বাহিত হয়! সেই অনন্ত বিধির দুই একটীর আবিষ্কার করিয়া মানব মন আস্ফালন করে, তাহাকেই জ্যোতির্ব্বিদ্যা অভিধান প্রদান করে। গোষ্পদে যেমন অনন্ত আকাশের প্রকার মাত্র প্রতিফলিত হয়, মানুষের জ্ঞান বিজ্ঞানেও সেইরূপ ঈশ্বরের অনন্ত সৃষ্টির আভাস মাত্র প্রত্যক্ষ হয়। মানব মনের বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে বিজ্ঞানের ভাবী উন্নতি ও সৃষ্টির অসীমতার তুলনা করিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়!

আমাদিগের অধিষ্ঠান-ভূতা পৃথিবী বহু পরিমিত বায়ু মণ্ডলে পরিবেষ্টিত। উত্তাপ আলোক ও বাষ্প সেই বায়ু মণ্ডলকে আশ্রয় করিয়া কি আশ্চর্য্য কার্য্য সকলই সম্পাদন করিতেছে। বায়ু এমন স্বচ্ছ যে, বায়ুসাগরে নিমগ্ন থাকিয়াও আমরা উহা দেখিতে পাই না। এই বায়ু এমন লঘু যে, ক্ষুদ্র পতঙ্গের শ্বাসযন্ত্রে অনায়াসে প্রবেশ করিতে পারে। এই তরল ও লঘু বায়ুস্রোতে মিশ্রিত হইয়াই কুসুমের সুগন্ধ মানবের নাশারন্ধ্রে প্রবেশ করে; এই বায়ুর তরঙ্গ কর্ণ কুহরে আঘাত করে বলিয়া মানবের শব্দ জ্ঞান হয়। এই বায়ু তরল এবং লঘু না হইলে জীবের জীবন রক্ষা হইত না; বায়ুভারে জীবগণ ভূপৃষ্ঠে পেষিত হইত। এই বায়ু গতিশীল না হইলে সমুদ্র হইতে বাষ্প উত্থিত হইয়া

মেঘরূপে সমুদ্র মধ্যেই বর্ষণ করিত, অনাবৃষ্টিতে পৃথিবী উৎসন্ন হইয়া যাইত। এই বায়ু না থাকিলে বিহঙ্গেরা পক্ষ গুটাইয়া বৃক্ষের যে শাখা অবলম্বন করিত, চিরদিন তাহাতেই তদবস্থায় থাকিত। পৃথিবী প্রশান্ত সাগরগর্ভে নিক্ষিপ্ত হইলে যেমন ভয়ানক অন্ধকারে থাকিত, এই বায়ু স্বচ্ছ না হইলেও তাহার সেই অবস্থা ঘটিত। এই বায়ু পরিচালক না হইলে কোন কারণে যেখানে উত্তাপের আধিক্য ঘটিত, সে স্থান দগ্ধ হইয়া যাইত; কোন স্থান বা দারুণ শীতে বিনষ্ট হইয়া যাইত। যে বায়ু মনুষ্যের স্থূল দৃষ্টির বহির্ভূত, যাহা আমাদিগের চিন্তাচক্ষে উপেক্ষণীয়বৎ, তাহার ঈদৃশ উপযোগিতা! জ্ঞানময় পরমেশ্বর তাহাকেই সৃষ্টি রক্ষার এমন আশ্চর্য্য উপাদান করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

আলোক অভাবে সংসারে সৌন্দর্য্য নামে কিছু থাকিতে পারিত না। এই আলো এক দিকে যেমন জগতের অন্ধকার বিদূরিত করে, অপরদিকে নানা বর্ণের সৃষ্টি করিয়া অসীম বৈচিত্র ঘটায়। এই আলোর অভাবে অট্টালিকা যেমন শ্মশান সমান, প্রস্ফুটিত শতদলও সেইরূপ কুৎসীত উপলখণ্ডবৎ। যদি দিবসত্রয় জগতে আলোক একেবারে নির্ব্বাপিত হইয়া যায়, তাহা হইলে প্রাণী জগতে কি ভয়ঙ্কর আর্ত্তনাদ উপস্থিত হয়! মাতৃক্রোড়ে শিশু অপরিচিতবৎ ক্রন্দন করে, অতুল ভাণ্ডারের অধিকারী অনাহারে প্রাণে মরে, দিক দেশ ও দ্রব্য জ্ঞান মনুষ্যমন হইতে বিলুপ্ত হয়, এক দিকে সৌন্দর্য্য ও লাবণ্যের সমুচ্ছেদ হয়, অপরদিকে অনাহার অত্যাচার ও অসহায়তায় প্রাণীমণ্ডলের ধ্বংশ হইতে থাকে। আলোর এত প্রয়োজন, এইজন্য আলোর গতি এত অধিক।

উত্তাপের আশ্চর্য্য ক্ষমতা। উত্তাপ প্রাণীদিগের জীবনী-শক্তি

ও জড় পদার্থের গতির কারণ। এই উত্তাপ ভূপৃষ্ঠ-সন্নিহিত বাষ্প-রাশির উষ্ণতা ও তরলতা রক্ষা করে, না হইলে সমগ্র পৃথিবী তুষার রাশিতে পরিপূর্ণ হইত, শ্বাস প্রশ্বাসের চেষ্টায় জীবের নাশারন্ধ্র বিদীর্ণ হইয়া যাইত। এই উত্তাপের আধিক্যে কোন স্থানের বায়ুরাশি লঘুতর হইয়া ঊর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকে, অপর দিক হইতে প্রবল বায়ুস্রোত আসিয়া তাহার স্থল পূর্ণ করে, এইরূপে ঝটিকার জন্ম। যে বায়ু বাসন্তী ঊষার সহচর হইয়া জগতকে নবজীবন প্রদান করে, যে বায়ু সবনীস্নাত হইয়া সুস্নিগ্ধ শীকর সিঞ্চনে ও কুসুম সৌরভে শ্রান্ত পথিকের শুশ্রূষা করে, সেই আবার বৃক্ষ লতার মূলোৎপাটন করিয়া, অট্টালিকা ভূমিসাৎ করিয়া হুহুঙ্কারে নৃত্য করে এবং জীবের জীবন লইয়া ক্রীড়া করে। একমাত্র উত্তাপই ইহার কারণ।

উত্তাপ পৃথিবীকে শোষণ করিয়া আকাশের বায়ুকে বাষ্পরাশিতে পরিপূর্ণ করে, আবার আপনি সরিয়া যায়, আর যথা সময়ে যথা স্থানে সেই বাষ্প জলবিন্দুতে পরিণত হইয়া ধরাতলে সিঞ্চিত হয়। বর্ষে বর্ষে ভূপৃষ্ঠের উর্ব্বরতা রক্ষার জন্য যত জলের প্রয়োজন, সেই জলরাশি কেমন আশ্চর্য্য নিয়মে বায়ুতে ভাসিয়া থাকে, আর বিন্দু বিন্দু হইয়া ভূপৃষ্ঠকে আঘাত না করিয়া, ফল ও শস্যের পুষ্প ও মুকুল না ভাঙ্গিয়া পৃথিবীতে সিঞ্চিত হয়। আবার এই বাষ্পের মধ্যেই কত বড় শক্তি লুক্কায়িত থাকে; যে ভয়ানক বিদ্যুতগ্নি চক্ষু পরাস্ত ও গগন কম্পমান করে, এই বাষ্পই তাহার জন্মদাতা। বিধাতার কি বিচিত্র সৃষ্টিকার্য্য। অন্তরীক্ষে আমরা যে উত্তাপ আলো বায়ু ও বাষ্প দেখিতে পাই, তাহার প্রত্যেকেই কি আশ্চর্য্য ভাবে কার্য্য সম্পাদন করে। আবার ইহাদিগের পরস্পরের সঙ্গেই বা কি চমৎকার সম্বন্ধ। বাষ্প

পৃথিবীকে উর্ব্বরতা দান করে, বায়ুর কম্পনে শব্দের উৎপত্তি, আলোর তরঙ্গে বর্ণের উৎপত্তি, আর উত্তাপে পৃথিবী চলচ্ছক্তি প্রাপ্ত হয়। গমনাগমন, আহার বিহার, এবং দর্শন ও শ্রবণে যেমন অকাট্য সম্বন্ধ, উত্তাপ আলোক বায়ু এবং বাষ্পেও ঠিক সেইরূপ আশ্চর্য্য সম্পর্ক। মানুষের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে জাগতিক সমস্ত ঘটনার মীমাংসা হয় না বলিয়া যদি বল, এ সকল অন্ধ শক্তির কার্য্য, বড়ই আস্পর্দ্ধা প্রকাশ পায় না কি?

ভূপৃষ্ঠে জল ও স্থলের কি চমৎকার সমাবেশ। উভয়ে পরস্পর ওতঃপ্রোত হইয়াই যেন বিধাতার কার্য্য সাধন করিতেছে। সমুদ্র মধ্যে দ্বীপপুঞ্জ যেন জলক্রীড়া করিতেছে। একটী একটী করিয়া বালুকণা সংগৃহীত হইয়া কত কত প্রকাণ্ড দ্বীপের উৎপত্তি হইয়াছে। আবার কি আশ্চর্য্য ব্যাপার, সমুদ্রবাসী অতি ক্ষুদ্র প্রবাল কীটের বাসস্থান নির্ম্মিত ও একত্র স্তূপীকৃত হইয়াইবা অগাধ সমুদ্র মধ্যে কত কত দ্বীপের উদ্ভব হইয়াছে! এদিকে পর্ব্বতের পাষাণময় দেহ বিদীর্ণ করিয়া কত নদনদী আর কত হ্রদ ও প্রস্রবণের সৃষ্টি হইয়াছে। পৃথিবীর স্তরে স্তরে নদী হ্রদ ও সমুদ্রাদি হইতে জল বিন্দু আসিয়া অনুপ্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, ভূপৃষ্ঠ খনন করিলে সেই জলবিন্দু একীভূত হইয়া তড়াগাদির সৃষ্টি হয়। বিধাতার কি আশ্চর্য্য সৃষ্টি, লবণাক্ত সাগরবারি অন্তরীক্ষে পরিশোধিত হইয়া অমৃতধারা রূপে ভূপৃষ্ঠে পতিত হয়। যদি সমুদ্রবক্ষের এরূপ অসীম বিস্তার না হইত, তাহাহইলে অন্তরীক্ষে এত অধিক বাষ্প সঞ্চিত হওয়া সুকঠিন হইত। তরঙ্গাকুল বিস্তীর্ণ সাগরবক্ষ ভয়ের কারণ বটে, কিন্তু বস্তুত উহাতেই দেশ দেশান্তরের দূরতা বিনাশ করিয়াছে। যে গতিতে ও যত পরিমাণে পণ্যভার লইয়া প্রকাণ্ড অর্ণবযান সমুদ্রবর্ক্ষে গমনাগমন করে, বহির্বাণিজ্যের এরূপ সুবিধা

বিজ্ঞানের বর্ত্তমান উন্নতি-সম্বলে মনুষ্যবুদ্ধি আর দ্বিতীয় হইতে পারে না। ভূপৃষ্ঠের স্থলভাগ মনুষ্যের আবাস ভূমি, আর জলভাগ তদীয় গমনাগমনের ও বিনিময়-কার্য্যের সুতরাং সভ্যতা ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির পথস্বরূপ। এইজন্য দেশের যে স্থান উপকূলের যত নিকটবর্ত্তী, সে স্থানের সভ্যতার এত উন্নতি। আবার এক এক স্থানে পরমেশ্বরের জ্ঞানকার্য্যের পরিচয় পাইয়া অবাক হইয়া থাকিতে হয়। অনেক স্থানেই সমুদ্রের কূলভাগ পাষাণে গঠিত। ভারতের দক্ষিণ ও পশ্চিম উপকূলে বহুদূর পর্য্যন্ত এরূপ পাষাণের বাঁধ রহিয়াছে। সমুদ্রের প্রবল তরঙ্গমালা প্রতিনিয়ত কূলভাগে আঘাত করে। সহস্র সহস্র মত্তমাতঙ্গ অপেক্ষা উহার এক এক তরঙ্গের বল কত অধিক! যদি ঐরূপ দৃঢ়তর পাষাণময় বাঁধ না থাকে, তাহা হইলে অল্পকাল মধ্যেই দাক্ষিণাত্য-ভাগ ভারত সাগর-গর্ভে বিলীন হইয়া যাইতে পারে।

ভূমণ্ডলে জন্ম গ্রহণ করিয়া যাহারা সমুদ্র পর্ব্বত বা মরুভূমি সন্দর্শন করে নাই, ইহ জন্মে তাহাদিগের নয়নের সার্থকতা সম্পাদিত হইল না। যখন গভীর ও অসীম বিস্তৃত নীলাম্বুরাশি স্তিমিত ভাব ধারণ করে, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে শান্তি ও গাম্ভীর্য্য যেন মনকে আয়ত্ত করিয়া ফেলে। যখন সেই অসীম জলরাশি উত্তুঙ্গ পর্ব্বত-শ্রেণীবৎ তরঙ্গমালা উঠাইয়া গর্জ্জন করিতে থাকে, বায়ুসংগ্রামে পরিক্লান্ত হইয়া ফেনরাশি উদ্গীরণ করে, তখন তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে জড়শক্তির মাহাত্ম্যজনিত ভয় ও স্রষ্টার প্রতি অসীম সম্মাননার উদ্রেক হয়, আর মূর্ত্তিমতী কার্য্যশীলতা মনুষ্যের দৃষ্টিপথে প্রবেশ করিয়া মানুষের হৃদয়কে আলোড়িত করে। আবার যখন প্রভাত সমীরণ সংযোগে বারিধিবক্ষ মৃদু মৃদু নৃত্য

করিতে থাকে, তখন উদযোন্মুখ প্রাতঃসূর্য্যের আবক্তিম কিরণ-মালা তদুপরি বিক্ষিপ্ত হইয়া যে অনুপম সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়, কল্পনার তুলিকায় দুর হইতে তাহা চিত্রিত করা অসম্ভব।

পরিব্রাজকেরা অনেকেই কহিয়া থাকেন, সমুদ্র অপেক্ষা মরু-ভূমির বিচিত্রতা অধিক। অধিকাংশ মরুভূমিই শুষ্ক সাগর-তল বই আর কিছুই নহে। জগতের এমনই আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন, আজ যাহা উত্তুঙ্গ গিরিশৃঙ্গ, শতবর্ষ পরে হয়তো তাহাই অতলস্পর্শ সাগরে পরিণত হইবে, আর সুগভীর সাগরগর্ত্ত শুষ্ক হইয়া মরুভূমির উৎপত্তি হইবে। মরুভূমির দৃশ্য কি ভয়ানক। দিগদিগন্তর ব্যাপিয়া কেবল প্রস্তর বালুকারাশি ও কণ্টকময় ক্ষুদ্র গুল্ম ভিন্ন আর কিছুই নয়ন পথে পতিত হয় না। যখন এই সকল অসীম মরুক্ষেত্রে ঘোর বাত্যা প্রবাহিত হয়, অপার বালুকারাশিতে গগনমণ্ডল ঘনতররূপে আচ্ছন্ন হয়, তখন যে কি ভয়ানক দৃশ্য উপস্থিত হয়, বর্ণনা করা অসাধ্য। এই সকল মরুভূমি শীতাতপের শ্মশানভূমি স্বরূপ। শীত ঋতুতে রাত্রি-কালে মভূরুমিতে যেরূপ শীতপাত হয়, তাহার প্রথমস্পর্শে জীব শরীরের উষ্ণতা হরণ করিয়া লয়। আবার গ্রীষ্মকালে মধ্যাহ্ন সূর্য্যের কিরণজাল এমনই অগ্নিরাশি বিকীর্ণ করে যে, ভ্রাম্যমান উষ্ট্রাদি পশু উত্তাপে অবসন্ন হইয়া ভূতলে পতিত হয়, দারুণ পিপাসায় প্রাণ পরিত্যাগ করে, আর এক উদয়াস্তের মধ্যেই মৃত-দেহ অস্থিচর্ম্মে পরিণত হইয়া যায়, গলিত হইবার অবসর পায়না।

মধ্যে মধ্যে এই সকল মরুভূমিতে মরীচিকার সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত বায়ুরাশিতে অতি দূরবর্ত্তী গ্রাম নগরাদি প্রতিবিম্বিত হইয়াই এই অতি মনোহর দৃশ্য জন্মে; ধরাতলে এমন বিভ্রম-জনক সৌন্দর্য্য আর নাই। জগতের কার্য্য সাধন জন্য সমুদ্র শুষ্ক হইয়া মরুভূমিতে পরিণত হয়, আবার সেই বালুসাগর

মধ্যেও কোথাও কোথাও অতি পরিপাটি উর্ব্বর জনপদ সকলের উদ্ভব হয়। এই সকল "ওয়েসিস" থাকাতেই দুর্গম মরুভূমি মানবের গমনোপযোগী হইয়াছে। বহুক্রোশ পর্য্যটন করিয়া শ্রান্ত পথিকেরা এই সকল বন্ধুভূমিতে আশ্রয় লাভ করে।

ভারতের উত্তর দিকে হৈমগিরিশ্রেণী যেন সত্য সত্যই পৃথিবীর মানদণ্ড রূপে বিস্তৃত হইয়া রহিয়াছে। এই সকল পর্ব্বত কেবল তরঙ্গায়িত স্থলভাগ বই আর কিছুই নয়। কোথাও বা উন্নত শৃঙ্গ, কোথাও বা গভীর গহ্বর, আর কোথাও বা সমতল উপত্যকা বিরাজ করিতেছে। এই পুরাতন পর্ব্বতশ্রেণী অনন্ত রত্নের আধার স্বরূপ। উহারা প্রস্রবণের পরিষ্কার সলিল, অরণ্যের সারবান কাষ্ঠ, মৃদঙ্গার মৃগনাভি স্বর্ণ রৌপ্য লৌহ প্রভৃতি খনিজ ধাতুর উৎপত্তি স্থল। সমুদ্রবক্ষ সুগভীর বলিয়া যেমন তাহাতে অসীম জলরাশি সঞ্চিত রহিয়াছে, পর্ব্বতদেহ উন্নত বলিয়াই আবার সেইরূপ উহার মস্তকে অপরিমেয় জলরাশি ঘনীভূত হইয়া রহিয়াছে; তাহা হইতে প্রস্রবণের উৎপত্তি হইয়া নিম্নদিকে জলস্রোত যাইয়া জীবের জীবন রক্ষা করিতেছে।

অনতিদূরে হিমালয়ের যে সৌন্দর্য্য, তাহা বর্ণন করা অসাধ্য। যেন আকাশের অঙ্গে হরিৎবর্ণ তরঙ্গমালা উত্থিত হইয়াছে। তরঙ্গের উপর তরঙ্গ, তাহার উপরে তরঙ্গ, কোথাও বর্ণের কিঞ্চিৎ গাঢ়তা, আর কোথাওবা কিঞ্চিৎ লঘুতা। হিমালয়ের কটিদেশে বিদ্যুদ্দামের সঙ্গে মেঘমালা ক্রীড়া করিতেছে, হিমালয়ের শীর্ষদেশ চিরতুষারাবৃত। উহাতে কখন কখন সূর্য্যরশ্মি পতিত হইয়া অপূর্ব্ব শোভার সৃষ্টি করে। নিম্নভাগে উপত্যকা ভূমিতে পর্ব্বতবাসীদিগের পল্লী যেন পর্ব্বতের হরিত বক্ষে শুভ্র চন্দনচর্চ্চাবৎ প্রতীয়মান হয়। পর্ব্বতদেহে বহুদূর উত্থিত হইয়া নিম্ন দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে চমৎকৃত হইতে হয়। ভূপৃষ্ঠের

বন্ধুরতা চলিয়া যায়, আব তদুপরে অবস্থিতপ্রকাণ্ড প্রকাণ্ড পদার্থ সকলকেও অতি ক্ষুদ্র দেখা যায়; প্রকাণ্ড গজযূথকেও মেষপাল বলিযা মনে হয়। পর্ব্বতেব পাদদেশে প্রবাহিত প্রশস্ত স্রোতস্বতীকে ও সঙ্কীর্ণ বজতবেখা বলিয়া ভ্রম জন্মে। যদি সৃষ্টিব সৌন্দর্য্য অবলোকন করিয়া চিত্তের তৃপ্তি ও নয়নেব সার্থকতা সাধন কবিতে হয়, তাহা হইলে পর্ব্বত সমুদ্র ও মরুভূমি পর্য্যবেক্ষণ কবা আবশ্যক। মরুভূমিব মরীচিকা, সাগরেব তরঙ্গমালা, পর্ব্বতেব অসীম সৌন্দর্য্য, নক্ষত্র পবিবৃত আকাশেব অনন্ত নীলিমা, বসন্তেব প্রভাতে উদ্যানের লাবণ্য, ও শরতেব প্রদোষে তড়াগেব সৌন্দর্য্য যে স্থিরনেত্রে প্রত্যক্ষ না কবে, তাহাব হৃদয় নিরেট শুষ্ক ও ভাবশূন্য, আব তাহার জীবন সত্য সত্যই অনুযোজ্য।

বায়বীয় ও খনিজ পদার্থ অপেক্ষা উদ্ভিজ্জ ও জীব শবীরে চমৎকারিতা অনেক অধিক। অতি ক্ষুদ্র বীজ ভূমিতে প্রোথিত হইলে কেমন আশ্চর্য্য নিয়মে তাহা হইতে অঙ্কুরোৎপাদন হয়। সেই অঙ্কুর ক্রমে কাণ্ড প্রকাণ্ড পল্লব ও পত্র বিস্তাব কবিয়া মহাবৃক্ষে পবিণত হয়। চক্ষুর অগোচর ক্ষুদ্র কীটানু হইতে বৃহদায়ত তিমিঙ্গিল পর্য্যন্ত যেমন বিভিন্ন আকাবের অসংখ্য জীব ভূমণ্ডলে অবস্থিতি করিতেছে, অতি সূক্ষ্ম শৈবালসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া অতি বৃহৎ বটবৃক্ষ পর্য্যন্ত নানাবিধ উদ্ভিজ্জ সেই রূপ ভূপৃষ্ঠকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। প্রাণী মণ্ডল যেমন সকলেই কোন না কোন রূপে জগতেব কার্য্য সাধন কবে। উদ্ভিজ্জদিগেরও কাহার ফল কাহার পুষ্প কাহার মূল কাহাব মুকুল কাহার ত্বক আর কাহার খাস এবং কাহারওবা নির্য্যাসে জনসমাজের কার্য্য সাধিত হয়। প্রাণীবর্গ যেমন কেহ বা মানুষের আহার্য্য ও পরিচ্ছদ প্রদান করে, কেহ বা বাহন হয়,

আর কেহ বা গৃহরক্ষায় নিযুক্ত থাকে; উদ্ভিজ্জগণও সেইরূপ কেহ বা ফলশস্য প্রদান করে, কেহ বা গৃহসামগ্রী যোগায়, কেহ বা ইন্ধন কাষ্ঠ আর কেহ বা ঔষধাদি প্রদান করে। এক ক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া একরূপ তৃণ আহার করিয়া গাভী যেমন দুগ্ধ প্রদান করে, আর অশ্ব যেমন শকট আকর্ষণ করে; সেইরূপ এক ভূমিতে রোপিত হইয়া, একই মৃত্তিকার রসাকর্ষণ করিয়া খর্জ্জুর ও তিন্তিড়ী বৃক্ষ অম্ল ও শর্করা প্রদান করে। গবাদির স্তনমূলে যেমন দুগ্ধ সঞ্চিত হয়, ইক্ষুদণ্ডের পর্ব্বে পর্ব্বেও সেইরূপ মিষ্ট রস সঞ্চিত হইয়া থাকে। ইহা দেখিয়া কাহার চিত্ত করুণাময় পরমেশ্বরের প্রতি কৃতজ্ঞতারসে অভিষিক্ত না হয়? ভোজ্য বস্তু শোণিতে পরিণত হইয়া সেই শোণিতধারা শিরায় শিরায় যেমন সর্ব্ব শরীরে সঞ্চালিত হয়, এবং এইরূপে যেমন অস্থি মস্তিষ্ক মেদ মাংস ও পেশি সকলের পরিপোষণ হয়, মৃত্তিকার রসও সেইরূপ বৃক্ষের মূল দেশ হইতে আরম্ভ করিয়া পত্রে পত্রে গমন করিয়া ত্বক মজ্জা পত্র পল্লবাদিকে বর্দ্ধিত করে ও সজীব রাখে। জীবগণ যেমন বায়ুতে শ্বাসপ্রশ্বাস করিয়া জীবিত থাকে, বৃক্ষগণও ঠিক সেইরূপ। আবার জীব শরীরের সঙ্গে উদ্ভিজ্জদিগের এমনই আশ্চর্য্য সম্বন্ধ যে, জীবগণ যে বায়ু প্রশ্বাসে নির্গত করে, উদ্ভিজ্জেরা তাহাই নিশ্বাসে গ্রহণ করিয়া জীবিত থাকে; আর উদ্ভিজ্জদিগের পরিত্যক্ত বায়ুতে নিশ্বাস করিয়া জীবগণ জীবন ধারণ করে।

একদিকে উদ্ভিজ্জের উৎপত্তি ও উপকারিতা এইরূপ আশ্চর্য্য, অপরদিকে তাহাদিগের সৌন্দর্য্যের ইয়ত্তা নাই। সমভূমিতে শ্যামল দূর্ব্বাদল, পর্ব্বতদেহে শাল ও সেগুণাদির নিবিড় অরণ্য, দূর প্রান্তরে শাল্মলী ও কিংশুককুসুমচ্ছটা, সরসির শৈবালদল-সমাচ্ছন্ন স্বচ্ছ সলিলে প্রস্ফুটিত শতদলরাজি যেমন নয়ন মন

হরণ করে, সেইরূপ সদ্যোজাত ছাগশিশুর উল্লম্ফন, তড়াগ-বক্ষে মরালকুলের মৃদু সন্তরণ ও উড্ডীয়মান বলাকাশ্রেণীর আশ্চর্য্য শোভাও মানুষের চিত্তকে অপার আনন্দ প্রদান করে। সর্ব্বসুখদাতা পরমেশ্বরের সৃষ্টি কার্য্যের মধ্যে সর্ব্বত্রই যেন সৌন্দর্য্য ও সৌকর্য্য প্রতিযোগিতা করিতেছে।

ভূমণ্ডলে সৃষ্টির সর্ব্বোৎকৃষ্ট পদার্থ মনুষ্য। একদিকে মানব-দেহ যেমন কার্য্যক্ষমতা বিচিত্রতা ও লাবণ্যে পরিপূর্ণ, মানুষের অন্তর আবার ততোধিক বিস্ময়কর সৌন্দর্য্যে পরিপূর্ণ। প্রত্যেক লোমকূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ড লুক্কায়িত রহিয়াছে, এই পৌরাণিক অতিশয়োক্তি সম্পূর্ণ রূপেই অনর্থক নহে। বস্তুতঃ মানবদেহের যে দিকে দৃষ্টিপাত করা যায়, চিন্তাচক্ষু অসীম চাতুর্য্য ও অনন্ত পারিপাট্য দেখিতে দেখিতে পরাস্ত হইয়া যায়। ক্ষুদ্র ও বৃহৎ কত প্রকারের কতগুলি অস্থিখণ্ড সংযুক্ত হইয়াই যে মানবদেহের কঙ্কাল রচিত হইয়াছে। এই সকল অস্থিখণ্ডের বন্ধন-রজ্জু কেমন দৃঢ় ও স্থিতিস্থাপক। ইচ্ছানুরূপ অঙ্গসঞ্চালনে কোন প্রকারের উদ্বেগ বা অপারগতা উপস্থিত হয় না। এই কঙ্কালের অস্থি সকল সছিদ্র এবং রসের আধার মেদে পরিপূর্ণ। এই কঙ্কালের উপরে পেশী ও মাংসরাশি জড়িত হইয়া রহিয়াছে, আর তাহার উপরে চর্ম্মাচ্ছাদন। আবার সর্ব্বাঙ্গ ব্যাপিয়া স্থূল ও সূক্ষ্ম শিরা ও ধমনী সকল এক দিকে অস্থি মাংসও চর্ম্মের সংযোগ রক্ষা, অপর দিকে সর্ব্বত্র শোণিত সঞ্চালন করিয়া শরীরকে সজীব রাখিতেছে। এই মানব দেহের মধ্যে জ্ঞানেন্দ্রিয় সকলের কি আশ্চর্য্য সন্নিবেশ। চক্ষু কর্ণ প্রভৃতি কেমন পরিপাটী ও উপযুক্তরূপে স্থাপিত। হস্ত মুখ প্রভৃতি কর্ম্মেন্দ্রিয়গুলি একদিকে যেমন প্রয়োজন সাধন করে, অপর দিকে তেমনই দৈহিক শোভা সম্পাদন করে। হস্ত ও পদতল

কোমল অথচ মসৃন নহে; অঙ্গুলীসকল খণ্ডিত ও প্রযোজনা-স্বরূপ হ্রস্ব ও দীর্ঘ, এবং অঙ্গুলীর অগ্রভাগ অপেক্ষাকৃত কঠিন নখরাবরণে আবৃত বলিয়াই মানুষের ধাবন ও ধারণ ক্ষমতার উপযোগী হইয়াছে। সর্ব্বাঙ্গে নিবিড ও অনিবিড় কেশরাশি একদিকে শরীরের শোভা সম্পাদন করে, অপরদিকে শরীরের উষ্ণতা রক্ষা ও শারীরিক ক্লেদাদি শোষণ ও নির্গমনের পথ পরিষ্কার রাখিয়া স্বাস্থ্য রক্ষার সহায়তা করে। মস্তিষ্ক মেদও রক্তাধারের সঙ্গে জীবন মৃত্যুর অতি ঘনিষ্ট সম্পর্ক বলিয়াই উহা এমন কঠিন আবরণে যত্নে রক্ষিত হইয়াছে।

দেহের প্রত্যেক অঙ্গ কেবলই জ্ঞান ও কেবলই করুণার নিদর্শন স্বরূপ। মুখ মধ্যে দন্ত ওষ্ঠ ও রসনার সংযোগইবা কি আশ্চর্য্য। উহারা কিরূপ আশ্চর্য্য উপাদানে গঠিত, এবং চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় চতুর্ব্বিধ আহার্য্য গ্রহণের জন্যই পূর্ণরূপে উপযুক্ত। চক্ষু কর্ণ নাশারন্ধ্র ও হস্ত পদ, জীবশরীর মধ্যে এ সকলই দুইটী করিয়া প্রদত্ত, উহাতে কার্য্যের অধিকতর সুবিধা হয়, দৈহিক সৌন্দর্য্য সাধিত হয়, আর কোন অনিবার্য্য কারণে একটী বিনষ্ট ও অব্যবহার্য্য হইলেও অপরটী দ্বারা কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে। কেবল দেহের উপযোগীতা ও সৌন্দর্য্যই সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞানগরীমার পরিচয়স্থল নহে। মনুষ্য অপূর্ব জ্ঞানবিশিষ্ট বলিয়াই বিধাতা তাহাকে কোন কোন বিষয়ে অখণ্ড্য নিয়মের অধীন, অপিচ কতক পরিমাণে স্বাধীন করিয়াছেন। সেই জন্যই শরীর রক্ষার সম্পূর্ণ ভার মানবের হস্তে অর্পণ করেন নাই, করিলে মানুষ মুহূর্ত্ত কালও জীবিত থাকিতে পারিত না। শরীরযন্ত্রের কতকগুলি অঙ্গ স্বাধীন, আর কতকগুলি মানুষের ইচ্ছার আয়ত্ত। জীবন রক্ষার জন্য শ্বাসযন্ত্র ও পাকযন্ত্রের কার্য্য প্রতিনিয়ত সমভাবে সাধিত হওয়া আবশ্যক, এই জন্য জাগ্রতে কি নিদ্রাতে

ঐ কার্য্য আপনা আপনি সম্পাদিত হইতেছে। মানুষ আহারের সংস্থান ও আহার্য্য গ্রহণ করে বটে, কিন্তু ক্ষুধার উদ্রেক, পরিপাক ও মলনির্গম কার্য্য স্বভাবতঃ হইয়া থাকে।

মানুষের বহিঃপ্রকৃতি অপেক্ষা অন্তঃপ্রকৃতির আলোচনা অধিকতর আনন্দের নিদান। অস্থি চর্ম্ম মেদ ও মাংসে যেমন মানবদেহ গঠিত, মানবাত্মাও সেইরূপ কতিপয় উপকরণে গঠিত। উহার প্রথম উপকরণ বিশ্বাস ও বিবেক, দ্বিতীয় ইচ্ছাশক্তি, তৃতীয় হৃদয়, এবং চতুর্থ মন। বিশ্বাস ও বিবেকের অনুশাসনে, হৃদয়ের উত্তেজনায় এবং মনের সাহায্যে মানুষের ইচ্ছাশক্তি কার্য্য করে। বিশ্বাস কেমন অহৈতুকী চিত্তবৃত্তি, বিবেকের কি অযাচিত অনুশাসন, মানব হৃদয় প্রেম সাহস ভয় বিরাগাদি কি চমৎকার ভাবরাশিতে পরিপূর্ণ; আর মানবের মন চিন্তা কল্পনা ও ধারণা প্রভৃতি কি অদ্ভুত শক্তির আলয়। আবার মানুষের ইচ্ছাশক্তি কি আশ্চর্য্যরূপে এই সকলের অনুবর্ত্তন ও কার্য্যসাধন করে। যিনি স্থির মনে মানব মনের চিন্তাপ্রণালী, কল্পনার কমনীয় লীলাচাতুরি, মানব হৃদয়ের বিবিধ ভাবের বিচিত্র তরঙ্গমালা, মানবাত্মার বিশ্বাসের গতি ও বিবেকের অনুশাসন এবং মানুষের ইচ্ছাশক্তির অনির্ব্বনীয় পরাক্রম পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারেন, পৃথিবীতে স্বর্গের শোভা নিরীক্ষণ করিয়া অপার্থিব সুখ সম্ভোগ করিতে তিনিই সমর্থ।

মানুষের অন্তঃকরণের সঙ্গে মানবদেহের কি চমৎকার সম্বন্ধ। জীবিতকালে মানুষের মনের কাজ মস্তিষ্কে, হৃদয়ের কার্য্য রক্তাধারে, এবং ইচ্ছাশক্তির কার্য্য কর্ম্মেন্দ্রিয় সকল দ্বারা সম্পাদিত হয়। অকস্মাৎ কোন কৌতুককর ঘটনা প্রত্যক্ষ করিলেই মানুষ হাস্য করে; অথচ শরীর ও আত্মার সংযোগে

মুহূর্ত্ত মধ্যেই যে কতগুলি কার্য্য হইযা যায, তাহা অল্প লোকেই চিন্তা কবিয়া থাকে। হাস্যকব ঘটনা প্রত্যক্ষ কবিবামাত্র উহা মস্তিস্কে নীত হয়, মস্তিস্ক হইতে হৃদয়ে যাইযা প্রসন্নতা জন্মায; আব সেই প্রসন্নতা পুনরায চক্ষু ও গণ্ডদেশ দ্বারা মুখ-মণ্ডলে বিস্ফুবিত হইয়া পড়ে। যখন কোন দযাবান ব্যক্তিব কর্ণকুহবে প্রতিবেশীর কাতব ক্রন্দনধ্বনি প্রবেশ কবে, তখনই তাঁহাব হৃদযে সহানুভূতিব উদ্রেক হয়; হৃদযের উত্তে-জনায় তিনি স্থান ও পাত্রের অনুসন্ধান কবেন, শোকেব কারণ নির্ণয কবেন, আপনাব অসাধ্য না হইলে দুঃখ দূব করিবার উপায মস্তিস্ক দ্বাবা চিন্তা কবেন, এবং ইচ্ছাশক্তিব প্রযোগ কবিযা আর্ত্তেব দুঃখ দূব কবেন।

এই ইচ্ছাশক্তিব সঙ্গে ইন্দ্রিযগুলিব কেমন ঘনিষ্ট সম্বন্ধ, উহা-দিগেব উপব ইহার কেমন আশ্চর্য্য কর্ত্তৃত্ব। উৎকট দৃশ্য দেখিলে অন্তরে যেমন অতর্কিত রূপে ভয উপস্থিত হয,যদি সেইরূপ সহসা পলাযন কবিবাব শক্তি না থাকিত,—বিচাব কবিয়া আশুকর্ত্তব্য স্থির হইলে, যদি উপায অবলম্বন কবা না যাইত, তবে কেমন ভয়ানকঅবস্থা হইত। মোদকখণ্ড মুখমধ্যস্থ হইলেই যেমন ভক্ষ-ণেচ্ছা জন্মে ও রসনামূলে লালাব সঞ্চার হয, যদি দন্ত ও বসনাদি চালন সেইরূপ অনাযাসসাধ্য না হইত,যদি সম্মুখস্থ পদার্থ ধরিতে হইলে ইচ্ছামাত্রে হস্ত অগ্রসব ও অঙ্গুলী বেষ্টন না কবিত, জীব-শরীব কি ঘোবতর বিড়ম্বনার কাবণ হইযা পড়িত। কিন্তু অনন্ত জ্ঞান ও করুণাময বিধাতার রাজ্যে তাহা হয় নাই, তাহা হইতে পারে না। যেখানে প্রকৃতিব ব্যভিচাব, যেখানেই সৃষ্ট বস্তুতে অপারিপাট্য, সেখানেই কোন লুক্কাযিত কাবণ রহিযাছে; উহা বিধাতার জ্ঞানময বিধির অপারগতার ফল নহে। প্রত্যুত কি ভৌতিক পদার্থ, কি উদ্ভিজ্জাদি, কি প্রাণীদেহ, কি মনো-

রাজ্য, যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, ঐশী শক্তি ও ঐশী করুণার অনন্ত নিদর্শন পাইয়া চিত্ত অবাক ও অধীর হইয়া বিধাতাকে অগণ্য ধন্যবাদ ও প্রণিপাত করিতে প্রস্তুত হয়।

ভারতের বীরত্ব।

ভারতের মলিন মানচিত্রে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে কতকগুলি অতীত কীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সেই সকল প্রত্যক্ষ করিবামাত্র স্মৃতি যেন কতকগুলি পুরাতন কাহিনী কর্ণকুহরে উচ্চারণ করিতে থাকে। সহৃদয় ভারতসন্তান ভাবযোগে সেই প্রাচীনকালে উপনীত হইয়া ভারতেতিহাসের কাণ্ডপরম্পরা স্বপ্নবৎ প্রত্যক্ষ করিতে থাকেন, কখনও বা ইতিহাসপটে ভারতের অঙ্গে কোন কালিমা দেখিয়া আপনাকে কলঙ্কিত জ্ঞানে ঘোর বিষাদে ভ্রীয়মান হয়েন, আবার কখনওবা স্বদেশের শৌর্য্য বীর্য্য সাধুতা ও সদনুষ্ঠান দর্শনে মুগ্ধ ও উৎফুল্ল হইয়া আশা উৎসাহ ও গৌরবের সহিত জন্মভূমির প্রতি দৃষ্টিপাত করেন।

কালের কুটিল আবর্ত্তনে বর্ত্তমানে পতিত ও নির্জীব হইয়া রহিয়াছে বটে, কিন্তু স্বর্ণভূমি ভারতবর্ষ চিরকাল বীরপ্রসবিনী বলিয়া জগতের নিকট পরিচিত। ভারতবর্ষ পৃথিবীর প্রতিকৃতিস্বরূপ; সমস্ত ইউরোপ মহাদেশে যত বৈচিত্র, এক ভারতে ততোঽধিক। উত্তুঙ্গ পর্ব্বতমালা, বেগবতী মহানদী ও ঘোরতর মরুভূমিতে ভারতবর্ষ সমাচ্ছন্ন; ভারতের লোক নানা বর্ণ ও নানা ভাষায় বিভক্ত। এরূপ অবস্থায় যদি কোন বীরপুরুষ সমগ্র আর্য্যাবর্ত্তে অথবা হিমালয় হইতে কুমারিকা পর্য্যন্ত বিজয় দুন্দুভি বাজাইতে পারেন, সমগ্র ইউরোপ বা

সমগ্র রোম রাজ্য পরাজয় করার পুরুষার্থ তাঁহাতে বর্ত্তে, সন্দেহ নাই। ভারত যখন জীবিত ছিল, ভারতের যখন চেতনা ছিল,এইরূপ অনেক ভারতীয় "সিজর" ও ভারতীয় "বোনাপার্টি" আর্য্যভূমে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। কেবল ভারতবর্ষের মধ্যে নহে, অনেকবার সিন্ধু ব্রহ্মপুত্র এবং সাগরসলিলের পর পারও ভারতের বীরপুত্রের পদভরে বিকম্পিত হইয়াছে; অনেকানেক পররাজ্যে ভারতের বৈজয়ন্তী উড্ডীন হইয়াছে। বৈদেশিকদিগের বিদ্বেষ-বিদূষিত ইতিবৃত্তও এই কথা একেবারে অস্বীকার করিতে পারে না।

প্রাচীন ও পৌরাণিক কালে ভারতে শত শত বীরসিংহের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। পরশুরামের একবিংশতিবার পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করণ, রঘুরাজ সৌমিত্রী ও অর্জ্জুনের দিগ্বিজয়, ভীষ্ম ভীম ও অভিমন্যুর পরাক্রম, বিক্রমাদিত্যের অপার্থিব বিক্রমকাহিনী আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠমালা স্বরূপ। কিন্তু হায়, প্রকৃত ইতিহাসের অভাবে ঐ সকল কাহিনী কবির উৎকট কল্পনায় জড়ীভূত হইয়া অলৌকিক উপন্যাসের অঙ্গীভূত হইয়াছে। কিন্তু মধ্য ও ইদানীন্তন কালেও ভারতবর্ষ বীরশূন্য ছিল না। মধ্যও ইদানীন্তন কালে রাজপুত শিখ্ও মহারাষ্ট্র, এই তিন সম্প্রদায় ভারতের পুরাতন সম্ভ্রম অক্ষুণ্ণ না হউক সঞ্জীবিত রাখিয়াছে। এই সকল সম্প্রদায়ের কতিপয় ভারতরত্নের জীবনের দুই চারিটী ঘটনা বিবৃত করিয়া আমরা বঙ্গের যুবক যুবতীদিগকে শৌর্য্য ও স্বদেশানুরাগে উদ্বুদ্ধ করিতে যত্ন করিব, এতৎপাঠে তাঁহাদিগের মনে স্বদেশীয় ইতিবৃত্তের প্রতি সমাদর ও স্বদেশের প্রতি মমতার কথঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইবে, ইহাই আমাদিগের আশা।

আর্য্য স্বাধীনতা পরহস্তে প্রদান করিবার পূর্ব্বক্ষণে প্রাতঃস্মরণীয় পৃথ্বীরাজ যেরূপ সিংহ-পরাক্রম প্রদর্শন করিয়া-

ছিলেন, ইতিহাস তাহা অনন্তকাল কীর্ত্তন করিবে। মহারাষ্ট্র মাহাত্ম্যের প্রতিষ্ঠাতা শিবসংকল্প শিবজী কিরূপ কঠোর সাধনা করিয়াই না পরপদ-প্রপীড়িত জাতীয় মহত্বকে সমুজ্জ্বল করিয়াছিলেন। উত্তাল তরঙ্গসঙ্কুল জলধিগর্ভে প্রবাল কীটেরা বহুযত্নে একটী দ্বীপ উৎপাদন করে, কালক্রমে সেই কীট-নিবাস বিশাল বিস্তৃতি লাভ করিয়া যেমন সাগরগর্ভ বিশুষ্ক করিয়া ফেলে; মোগল সাম্রাটের মহাপরাক্রমের সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া শিবজী যে জাতীয় স্বাধীনতার ভিত্তি সংস্থাপন করিয়াছিলেন, কালক্রমে তাহাই প্রসারিত হইয়া সেইরূপে মোগল রাজ্যকে দুর্ব্বল ও নিপীড়িত করিয়াছিল। এ সকল বিবরণ ইতিহাস-পাঠার্থীকে ভিন্ন গ্রন্থে প্রদান করিতে যাওয়া পুনরুক্তি ভিন্ন আর কিছুই নহে।

শিবজী সত্য সত্যই দেবতা ছিলেন। মোগল সাম্রাজ্যের সঙ্গে এরূপ সংগ্রাম করিয়া কৃতকার্য্য হওয়া সত্য সত্যই অলৌকিক ব্যাপার। মোগল সাম্রাজ্যের বল কত? কোন ইউরোপীয় ভ্রমণকারী বলিয়াছেন, "ইউরোপের তৎকালীন সমস্ত সৈন্যবল সংগ্রহ করিলেও মোগল ক্ষমতার সমকক্ষ হয় না। ঈদৃশ মোগল রাজ্য, আবার তাহার মস্তকে প্রতিষ্ঠিত, ধূর্ত্ততা নৃসংশতা ধর্ম্মান্ধতা ও ক্ষমতার সাক্ষাৎ প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ আওরাংজেব। এ সময়ে মহারাষ্ট্র-ক্ষমতার প্রতিষ্ঠা, এরূপ সময়ে স্বাধীন হিন্দুরাজ্য সংস্থাপন অলৌকিক কার্য্য সন্দেহ নাই।

যদি অধ্যবসায়-সম্বলিত উচ্চাভিলাষ ও অপরিণামদর্শিতা-বিহীন অকুতোভয়তা, যদি নিরহঙ্কার আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান ও আত্ম-নিগ্রহে পরীক্ষিত স্বদেশানুরাগ বীরত্বের লক্ষণ হয়, তবে ভূমণ্ডলে শিবজীর মত বীর পুরুষ অতি অল্পই জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। শুভক্ষণে যদুরাওর পুণ্যশীলা দুহিতা মালজীর উপযুক্ত পুত্রে

সমর্পিতা হইয়াছিলেন। এই সম্মিলন হরপার্ব্বতীর সম্মিলনের মত পুণ্যপ্রসূ; এই সম্মিলনেই শিবসুতসম শিবজীর জন্ম। পরাধীন ভারতে কবি নাই, না হইলে শিবজীর অভ্যুত্থানে দ্বিতীয় কুমারসম্ভবের সৃষ্টি হইত। আমরা পরাধীন,—পতিত, আমরা বীর-পরাক্রমের মর্ম্ম কি বুঝিব? জাতীয় মহত্ত্বের কাহিনী আমাদিগের নিকট স্বপ্নবৎ, তদর্থে সাধনাও ত্যাগ-স্বীকার আমাদিগের নিকট জল্পনা বই আর কি হইতে পারে? গগনবিহারী বিহঙ্গই অনন্তও পরিস্কার নীল নভোমণ্ডলে বিচরণ করিতে ভালবাসে, গর্ত্তের কীট গর্ত্ত মধ্যেই মলমূত্র পরিত্যাগ করে, এবং তাহাতেই নিদ্রিত থাকিয়া কৃতার্থ হয়। অহো! যে দেশে ভীষ্ম বিক্রমাদিত্য পৃথ্বিরাজ ও শিবজীর জন্ম, সে দেশের কি শোচনীয় পরিবর্ত্তন, অতি বিপুল সিংহনিবাস মেষমুজকের আবাসভূমি হইয়া পড়িয়াছে!

ভারতক্ষেত্রে রাজস্থান বীরত্বের পুণ্যতীর্থ স্বরূপ। রাজস্থানের প্রকৃত ইতিহাস পুরাণ বর্ণনাকেও পরাস্ত করে। পৃথিবীতে স্বাধীনতাপ্রিয় বীরত্বানুরাগী ও অস্ত্রদক্ষ জাতি রজপুতের মত কে ছিল? মৌলিকতার গর্ব্বে স্ফীতবপু প্রাচ্য চীন অথবা সভ্যতার শিরোমণি পাশ্চাত্য আমেরিক, এ উভয়কেই এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা কর, উভয়েই বলিবে—বীর্য্য ও স্বাধীনতার পবিত্র ভূমি রাজস্থান। রাজস্থানের ইতিবৃত্ত সংগ্রাহক উদারচরিত্র কলির ব্যাস কর্ণেল টড্, বলিয়াছেন "রাজস্থানের প্রতি পল্লি "ম্যারাথন" ও প্রতি বর্ত্ম "থারমোপলি" সদৃশ, এবং রাজস্থানের প্রতি বংশে "লিওনিডস" প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন" এইরূপ বীর ও এইরূপ সংগ্রাম ইউরোপের শিক্ষাগুরু গ্রীক জাতির পুরাতন ইতিহাসের শিরোভূষণ স্বরূপ। রাজস্থানের প্রতি বংশে তাদৃশ বীরের প্রাদুর্ভাব এবং প্রতিপল্লিতে সেইরূপ রণভূমির অস্তিত্ব,

রাজপুতনার বর্ত্তমান শোচনীয় অবস্থা দর্শনে কে বিশ্বাস করিতে পারে? কিন্তু একজন বৈদেশিক বীর পুরুষ রাজপুতনার ইতিহাস আলোড়ন করিয়া, এবং রজপুত বীরকীর্ত্তির ভগ্নাবশেষ স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ করিয়াই এই উক্তি করিয়াছেন।

গ্রীসদেশীয় মহাবীর সেকেন্দারসাহ দিগ্বিজয়ে বহির্গত হইয়া সিন্ধু নদ অতিক্রম করিয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়েন। পৃথিবীর কোন জাতি বীরত্বে রজপুত ইতিহাসকে অতিক্রম করিতে পারে নাই; রাজপুতনায়ও তাদৃশ বীর জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন। সূর্য্যবংশীয়-দিগের দেবদুর্ল্লভ বীরকীর্ত্তি কেবল রামায়ণ ও রঘুবংশেই পরিকীর্ত্তিত হইয়া শেষ হয় নাই। প্রমুবা বংশাবতংশ রজপুতকুল-তিলক বাপ্পারাও প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডের মত সমুত্থিত হইয়া সিন্ধু নদ হইতে ভূমধ্যস্থ সাগর পর্য্যন্ত সমুদয় যবন রাজাদিগকে পরাজিত করিয়াছিলেন, তুরস্কের তৎকালীন সুলতান বহু ধনরত্ন ও কন্যা দান করিয়া "হিন্দু সূর্য্যের" সঙ্গে সন্ধিস্থাপন করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সেকেন্দার সাহা হইতে বাপ্পারাওর বীরত্ব কিসে কম?

প্রাচীন কালে বিশেষতঃ মধ্যকালে স্কচ জাতি বীরত্ব ও স্বাধীনতাপ্রিয়তার জন্য সবিশেষ খ্যাতি লাভ করিয়াছিল। স্কটলণ্ডের সর্ব্বপ্রধান বীর "ররার্টব্রুস্," ও স্কচইতিহাসের সর্ব্ব প্রধান সংগ্রাম "ব্যানকবারণ"। রাজস্থানেও দ্বিতীয় ররার্টব্রুস প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, এবং দ্বিতীয় ব্যানকবারণের অভিনয় হইয়া গিয়াছে। প্রভেদ এই, প্রতাপসিংহ অধিকতর পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে দ্বন্দ্ব করিয়াছিলেন, এবং অধিকতর শৌর্য্য ও সহিষ্ণুতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। কিন্তু আর্য্য-স্বাধীনতার উপরে বিধাতার কোপ ছিল, এজন্য ব্যাণকবরণে যে ফল ফলিয়াছিল, হলদিঘাটে তাহার বিপরীত ফল ফলিয়াছিল। হলদিঘাটের

মহাসংগ্রাম ও রজপুত্র বীরের শৌর্য্যবীর্য্য স্মরণ করিতে সর্ব্বাঙ্গ বীর ও বিস্ময় রসে শিহরিত হয়।

চিতোর ধ্বংশের পর ক্রমে প্রায় সমস্ত রজপুত রাজাই মোগল সম্রাটের বশতাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু উদয়সিংহের পুত্র এই মহারাণা প্রতাপসিংহ কোন ক্রমেই মুসলমান আধিপত্য স্বীকার করিলেন না। প্রতাপসিংহ এই অভিমান অক্ষুন্ন রাখিবার জন্য বনে বনে পর্ব্বতে পর্ব্বতে অনাহারে অনিদ্রায় থাকিয়া যে সাধনা করিয়াছিলেন, যত সংগ্রাম করিয়াছিলেন, বিক্রমাদিত্যের তালবেতালসিদ্ধি, অর্জ্জুনের পাশুপৎ অস্ত্র লাভ, কি আলফ্রেডের অরণ্যবাসই কেবল তাহার সঙ্গে তুলনীয়। ১৫৭৬ খ্রীষ্টাব্দের স্মরণীয় এবং সমগ্র পৃথিবীর বিস্ময়ের কারণ হলদিঘাটের মহাসমরে এক দিকে দিল্লীশ্বরের অগণিত সৈন্য, পরাক্রান্ত মোগল সেনাপতি মহব্বৎ খাঁ, রজপুতকুলতার অন্যতর প্রতিভূ মহারাজ মানসিংহ, এবং স্বয়ং যুবরাজ সেলিম (উত্তরকালের জাহাঙ্গের সাহ) সমবেত! আর একদিকে দ্বাবিংশতি সহস্র রজপুত সৈন্যের অগ্রগামী প্রতাপসিংহ। যেন মহাভারতের সপ্তরথির সঙ্গে অভিমন্যুর সংগ্রাম উপস্থিত। এরূপ সংগ্রামের শেষ ফল পূর্ব্বেই অনুমিত হইতে পারে। প্রতাপসিংহের পরাজয় হইল। কিন্তু পৃথিবী দেখিতে পাইল, রজপুত কেমন বীর, রজপুতেরা স্বাধীনতার কেমন পক্ষপাতী। দ্বাবিংশতি সহস্রের মধ্যে চতুর্দ্দশ সহস্র ক্ষত্রিয় হলদিঘাটে ভূতলশায়ী হইল। স্বাধীনতার চরণে হৃদ্‌পিণ্ড উৎসর্গ করিয়া প্রতাপ সিংহ অনন্ত শত্রু সৈন্য মধ্যে যেরূপ সংগ্রাম করিয়াছিলেন, যদি বিজয়লক্ষ্মী স্নেহমমতাময়ী শরীরী দেবতা হইতেন, তাহা হইলে রজপুত স্বাধীনতার জন্য আর্ত্তনাদ করিতে করিতে রণক্ষেত্রে আত্মঘাতিনী হইতেন, সন্দেহ নাই।

রজপুত ইতিহাসের আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আমরা ক্ষান্ত হইতেছি। আমরা যে ঘটনার উল্লেখ করিব, তাহা স্মরণ করিতেই উৎসাহ আনন্দ ও বিস্ময়ে অন্তঃকরণ যুগপৎ আকুল হইয়া উঠে। আমরা কোন জাতির ইতিবৃত্তে এরূপ অমানুষী বীরত্ব ও নরলোকে এরূপ দেবঅভিনয় দেখিতে পাই না।

মোগলসূর্য্য আকবর দিল্লির সিংহাসনে আত্ম ক্ষমতা সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াই ভারতবীরত্বের দুর্গস্বরূপ রাজস্থান হস্তগত করিতে কৃতসংকল্প হইলেন, এবং তদর্থে বহুযত্নের পর বহু আয়োজনে মেওয়ারের রাজধানী চিতোর আক্রমণ করিলেন। ভারতবর্ষের অনেক ইতিহাসে এই চিতোরাক্রমণ ও চিতোর-জয়ের সামান্য উল্লেখ আছে, কিন্তু সেই ঘটনা উপলক্ষে যে এক অতি অদ্ভুত বীরত্বের অভিনয় হইয়াছিল, তাহা অনেকেই লিপিবদ্ধ করেন নাই। আকবর সাহ বহু সৈন্য লইয়া সংগ্রামে সম্মুখীন হইলে চিতোরের তদানীন্তন কাপুরুষ রাজা উদয়সিংহ, প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ জয়মল্লের উপরে নগররক্ষার ভার দিয়া পরিবারবর্গ সমভিব্যাহারে পলায়ন করিলেন। জয়মল ও তাঁহার সহযোগী সৈন্যাধ্যক্ষ পুত্তের পরাক্রমে, আকবর সাহ বহুকাল সংগ্রাম করিয়াও কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। অনন্তর আকবরের কোন অনুচর রজনীর অন্ধকারে লুক্কায়িত থাকিয়া গুলি বর্ষণে দুর্গ-প্রাচীরের তত্ত্বাবধানে নিরত জয়মলের প্রাণ নাশ করিলে, রজপুতপক্ষ অনেক দুর্ব্বল হইয়া পড়িল।

এ সময়ে পঞ্চবিংশতি বর্ষ বয়স্ক পুত্তই চিতোর-সেনার এক মাত্র নায়ক। সৈন্যসংখ্যার হ্রাস, জয়মলের মৃত্যু, মোগল ভূপালের পরাক্রম ও অতুল সৈন্যবল, ইহার কিছুতেই পঞ্চবিংশতিবর্ষ বয়স্ক রজপুত ক্ষত্রিয়কে বিচলিত করিতে পারিল না

তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা দ্বিগুণ উৎসাহে স্বদেশ রক্ষায় নিযুক্ত রহিলেন। রণনিপুণ মোগল ভূপতি আপন সৈন্যদিগকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়া উহার এক ভাগ স্বকীয় প্রধান সেনাপতির অধীনে পুত্তের সঙ্গে সংগ্রামে প্রেরণ করিলেন, এবং স্বয়ং অপর ভাগের অধিনায়ক হইয়া অপর দিক্‌হইতে রাজপুত সৈন্য আক্রমণ করিতে প্রস্তুত রহিলেন। যখন পুত্তের পরাক্রমে মোগল সৈন্য উত্তেজিত ও পরাজিতপ্রায় হইয়া উঠিল, আকবরসাহ সসৈন্যে অভিপ্সিত দিকে অগ্রসর হইতে লাগিলেন।

পুত্তের জননী কর্ম্মদেবী কেবল বীরপুত্রী বীরপত্নী ও বীরজননী ছিলেন না, তিনি স্বয়ংও শতস্কন্ধ-নাশিনী সীতা দেবীর মত বীররমণী ছিলেন। রাজপুত সৈন্য সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইলে, তিনি উভয় পক্ষের সংগ্রাম পর্য্যবেক্ষণ করিতেন, এবং অশ্বারোহণে রণক্ষেত্রে বিচরণ করিয়া আত্মপক্ষের মঙ্গল সাধনে যত্ন করিতেন। যখন পুত্ত এইরূপে মোগল সৈন্যসাগরে দুর্দ্ধর্ষ সংগ্রামে নিরত, তখন কর্ম্মদেবী মোগল সম্রাটের গতিবিধি নিরীক্ষণ করিয়া, মোগল সৈন্য অপর দিক্ হইতে অগ্রসর হইতে পারিলে, পুত্রের যে অপরিহার্য্য বিপদ ঘটিবে, তাহা বুঝিতে পারিলেন; এবং আকবর সাহের গতিরোধ করিতে যত্ন করিলেন।

কর্ম্মদেবী মোগল সৈন্যের গতিরোধ করিবার জন্য সৈন্যসজ্জা করিতে উৎসুক হইলেন বটে, কিন্তু তখন চিতোরের এক জন রাজপুতও সম্মুখ সংগ্রামে বিমুখ বা নির্লিপ্ত থাকিয়া গৃহে বসিয়া ছিল না। শত্রু সৈন্যের গতিরোধ করা চাই, এদিকে এক জনও সৈনিকপুরুষ নাই; কর্ম্মদেবী গৃহে যাইয়া স্বকীয় ষোড়শ বর্ষ বয়স্কা কন্যা কর্ণবতী ও অষ্টাদশ বর্ষ বয়স্কা পুত্রবধূ কমলাবতীকে রণসজ্জায় সুসজ্জিত করিলেন, এবং তিন জনে

মিলিয়া দুর্দ্ধার মোগল পবাক্রমের তবঙ্গ রোধ করিতে ছুটিলেন। সম্মুখে এক পাহাড়ময় অতি সংকীর্ণ বর্ত্ম, সেই বর্ত্ম মধ্যে পাশাপাশি হইযা এই তিন বীবাঙ্গনা দণ্ডায়মানা হইলেন।

অহো, কি আশ্চর্য্য সেই দৃশ্য। গিরিবর্ত্মের এক পার্শ্বে মোগল সম্রাটেব সহস্র সহস্র সৈন্য, আর এক পার্শ্বে তিনটী বীব রমণী, যেন মূর্ত্তিমতি পার্ব্বতী, লক্ষ্মী সরস্বতী সহযোগে দৈত্যদল দলনে সমুদ্যতা। অবলাব শবীব কোমল সন্দেহ নাই, কিন্তু অবলাব হৃদযেব বল কম নহে। এক দিকে হৃদয়েব বল, আব গিরিবর্ত্মের দুই একটী তরুলতা সেই বীবাঙ্গনাদিগের একমাত্র সহায। মোগল ভূপতি এই অসম্ভব দৃশ্য দেখিয়া স্মিতবদন হইলেন; কিন্তু ক্রমে বমণীদিগেব বীবত্ব দেখিযা মনে কবিলেন, উহাবা দেবতা, মানুষী নহে। তিনটী মাত্র রমণীব সঙ্গে অপবিমিত সৈন্যবল লইয়া সম্মুখ সংগ্রাম কবিতেছেন, এই চিন্তায় সহৃদয় মোগল বাজেব চিত্ত লজ্জাতে ম্রীয়মান হইয়া পডিল। প্রতিনিবৃত্ত হইতেও পাবেন না, শত্রুসৈন্য যথা সময়ে আক্রমণ কবিতে হইবে। আকবর সাহ চীৎকাব করিযা বলিতে লাগিলেন, "এই বীরাঙ্গনাদিগকে যে সৈন্য জীবত্ত ধবিযা দিতে পারিবে, তাহাকে অযুত মুদ্রা পাবিতোষিক প্রদান কবিব" সেই চেষ্টা নিঃস্ফল হইল। জ্বলন্ত অঙ্গাব কে গ্রাস কবিতে পারে? হয অগ্নি নির্ব্বাপিত হয়, না হয় দগ্ধরসনা হইয়া উৎক্ষেপ করিতে হয়। কিন্তু হায়, শেষকালে অগ্নি নির্ব্বাপিত হইল!

কিছুকাল সংগ্রাম করিয়া কর্ণবতী ভূতলশায়িনী হইলেন। প্রাণাত্যয় কালে কহিলেন "মা আমি চলিলাম!" মাতা কহিলেন, "বাছা ভয় নাই, অগ্রসর হও, আমিও আসিতেছি।" এই কথামাত্র উচ্চারণ করিলেন, তনয়াব মুখের দিকেও চাহি-

লেন না। ক্রমে যবন সৈন্যের মুহুর্মুহু অস্ত্রাঘাতে কমলাবতী ও কর্ম্মদেবী ভূতলশায়ীনী হইলেন; মোগল সৈন্য অগ্রসর হইতে লাগিল। এমন সময়ে শত্রুসৈন্য পরাজয় করিয়া মহাবীর পুত্ত সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন, মাতা ও পত্নী হন্তাকে শমন-ভবনে প্রেরণ করিয়া, এক হস্তে মাতা ও অপর হস্তে পত্নীকে লইয়া গৃহে গমন করিলেন। আসন্নকালে কমলাবতী পতির মুখে সতৃষ্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন "তবে যাই!" অষ্টাদশ বর্ষীয়া নবপরিণীতা নবযুবতী স্বদেশ ও স্বামীর বিপদ নিবারণ জন্য রণক্ষেত্রে প্রাণত্যাগ করিলেন, বর্ত্তমানের সুখ ও ভবিষ্যতের আশা শত্রুর তরবারিতে বিসর্জ্জন করিলেন। আবার তাদৃশ সতী যখন মৃত্যুকালে পতির মুখ চাহিয়া ইহ জীবনের জন্য বিদায় লইলেন, তখন সেই মুহূর্ত্তে, সেই শেষ বাক্যে হিমালয় সদৃশ পুত্ত বজ্রাহতবৎ হইলেন, কিন্তু স্থির রহিলেন, ক্ষত্রিয়নন্দন অবসন্ন হইয়া পড়িলেন না।

ধন্য কর্ম্মদেবী! মাতা অন্তিম শয্যায় শয়ন করিলে পুত্ত জননী পত্নী ও ভগিনীর শোকে কাতরতা প্রদর্শন করিলেন! তখন কর্ম্মদেবী কহিলেন, "বাছা, শীঘ্র যুদ্ধক্ষেত্রে গমন কর, স্বদেশের স্কন্ধের উপরে বিপদ, বিলাপ করিবার এই সময় নহে।" ধন্য রজপুত বীরাঙ্গনা! পৃথিবী চিরকাল এইরূপ বীরত্বের, এইরূপ নিস্বার্থ স্বদেশানুরাগের পূজা করিবে; ভারতবর্ষ যদি অনন্ত-কালও নিবিড় অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকে, তাহা হইলেও এই এক বীরাঙ্গনার মাহাত্ম্যে কহিনুর-কান্তি ধারণ করিয়া ইতিহাস-পাঠার্থীর নিকট উপস্থিত হইবে। আপনার বংশ নির্ব্বংশ, চক্ষু সমক্ষে প্রাণাধিকা কন্যা ও সাবিত্রীসমা পুত্রবধূ প্রাণত্যাগ করিল, শত্রুর অস্ত্রাঘাতে স্বয়ং মুমূর্ষু, অসম যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইলে পুত্রও বিপন্ন হইবে; এই সকল চিন্তা তাঁহার মনে উদিতহইল না,

শোক দুঃখ ও যাতনা তাঁহার অন্তরে স্থান পাইল না। স্বদেশের ভাবনা তাঁহার জীবনের সর্ব্বস্ব, আত্মবিস্মৃত হইয়া বলিলেন, "যুদ্ধক্ষেত্রে গমন কর, দেশের উপরে বিপদ।" পুরাকালে গ্রীক বীরাঙ্গনারা যে পুত্রকে সমরে প্রেরণ করিয়া, হয় জয়ী হইতে, না হয় সমরশায়ী হইতে আদেশ করিতেন, তাহার সঙ্গে তুলনায় কর্ম্মদেবীর এই আদেশের মূল্য কত অধিক! রজপুত বীরত্বের কোথায় তুলনা হইবে?

মাতার সৎকার করিয়া পুত্ত ক্ষিপ্ত শার্দ্দূলবৎ শত্রুসৈন্য মধ্যে পতিত হইয়া শত্রু সংহার করিলেন, এবং বৈরনির্য্যাতন ও রণোন্মাদে উন্মত্ত হইয়া সমরসাগরে অবগাহন ও শয়ন করিলেন। পুত্তের মৃত দেহ তদীয় পত্নীর কলেবরের সঙ্গে একত্রে সৎকার করা হইল। চিতোরের পুরুষ মাত্রে সম্মুখ সংগ্রামে প্রাণত্যাগ করিল, রমণীগণ জ্বলন্ত চিতায় দেহ বিসর্জ্জন করিলেন। আকবরসাহ চিতোর অধিকার করিলেন বটে, কিন্তু তখন চিতোর শ্মশান। চিতোরবাসীরা মাতৃভূমিকে পরপদে উৎসর্গ করিয়া দাসত্ব করিতে কেহই পৃথিবীতে রহিল না। মোগল সম্রাটের নির্ব্বেদের সীমা থাকিল না। এত অসংখ্য রজপুত চিতোর সংগ্রামে নিহত হইয়াছিল যে, তাহাদিগের কণ্ঠাভরণ ৭৪৷০ মণ হইয়াছিল! অদ্যাপি প্রাচীন সম্প্রদায়ের লোকেরা পত্র পৃষ্ঠে ৭৪৷০ অঙ্ক পাত করিয়া থাকেন; বিনানুমতিতে পরের পত্র পাঠ করিলে চিতোর সংগ্রামের ক্ষত্রিয় বধের পাপভাগী হইতে হয়, ইহাই উহার অভিপ্রায়।

মোগলরত্ন আকবর মহানুভব ও বীর পুরুষ ছিলেন; তিনি বীরত্বের মূল্য ও মর্য্যাদা বুঝিতেন। তিনি জয়মল, পুত্ত, কর্ম্মদেবী, কমলাবতী ও কর্ণবতীর প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করাইয়া স্থানে স্থানে স্থাপিত করিলেন। তিনি স্বকীয় জীবনবৃত্তে রজপুত

বীরত্বের ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু মোগল রাজ্যের উন্নতির ও বিস্তৃতির সঙ্গে সূর্য্যবংশীয়দিগের—রঘুরাজ ও রামচন্দ্রের বংশধরদিগের বীরত্ব এবং মূর্ত্তিমান ক্ষাত্রধর্ম্ম ভারতবর্ষ হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে। আবার কস্মিন্ কালে উহার পুনরুদ্ধার হইবে কি? এই প্রশ্নের উত্তরে নিদারুণ মর্ম্মবেদনা প্রদান করিবার জন্যই যেন প্রতিধ্বনি বলিতেছে—"কি বলিতেছে? হইবে কি।"

যাহারা শরীরের রক্ত দান করিয়া শিখদিগের মহত্বের ক্ষেত্র সিক্ত করিয়া যান, আর যাঁহার সময়ে শিখক্ষমতা মহত্বের পরাকাষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়া পৃথিবীর চিরপরিচিত বীর জাতিদিগেরও বিভীষিকার কারণ হইয়া উঠে, সেই মহাপুরুষদিগের জীবনের দুই চারিটী ঘটনার উল্লেখ করিয়াই আমরা এই প্রস্তাবের উপসংহার করিব। ১৭১৩ হইতে ১৭১৯ খৃঃ অব্দের মধ্যে মোগল সম্রাট ফেরকসের শিখদিগকে প্রায় নির্ম্মূল করিয়া ফেলিয়াছিলেন। তখনও শিখদিগের সংখ্যা অত্যন্ত কম ছিল, তাহাদিগের নিয়মিত অস্ত্রশিক্ষাদি কিছুই হয় নাই, তাহাদিগের অর্থ বা অস্ত্রবল অধিক কিছুই ছিল না। তাহারা রীতিমত সম্মুখ যুদ্ধ করিতে পারিত না। কেবল মোগল রাজ্যে লুণ্ঠনাদি করিয়া মুসলমানের বহুকালের অত্যাচারের কথঞ্চিত প্রতিশোধ লইত। এই জন্যই দিল্লিপতি একদল পরাক্রান্ত সৈন্য প্রেরণ করিয়া শিখদিগকে পরাভূত করেন। তাহারা অনেকেই সমরশায়ী হয়; আর সপ্ত শত অনুচরের সঙ্গে শিখ গুরু বন্ধু বন্দী হইয়া দিল্লিতে প্রেরিত হন। প্রথমতঃ নানাপ্রকার যাতনা দিয়া শিখদিগকে মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করিতে বলা হয়, তাহাতে অস্বীকৃত হইলে সপ্ত দিনে সপ্ত শতের শিরশ্ছেদ হয়! বন্ধুকে লৌহ পিঞ্জরে অবরুদ্ধ করিয়া নগরের পথে

পথে প্রদর্শন করে। বন্ধুর এক শিশু সন্তান সঙ্গে ছিল, প্রথমতঃ বন্ধুর হস্তে ছুরিকা দিয়া তাহাকে হত্যা করিতে বলে; বন্ধু অস্বীকার করিলে, বাক্‌সাধম নৃসংশ মুসলমানেরা সেই শিশুকে হত্যা করিয়া তাহাব শিবা ও শোণিত বন্ধুব মুখে প্রদান করে। এবং তৎপবে সন্দংশ-প্রয়োগ দ্বারা শিখগুরুকে হত্যা করে। সেই নিদারুণ যাতনায় ইষ্টদেবের নাম করিতে করিতে ধর্ম্ম-বীর প্রাণত্যাগ করেন।

ধর্ম্মবীবদিগের জীবনে অনেক অত্যাচাব ও ত্যাগ-স্বীকারে কথা আমরা শুনিতে পাই। অনেকেই জ্বলন্ত চিন্তায়, বন্য পশুর মুখে অথবা অস্ত্রাঘাতে অকাতরে প্রাণ দান করিয়া ধর্ম্মবল ও বিশ্বাসেব মাহাত্ম্য প্রদর্শন করিয়া গিযাছেন। বোধ হয় তাহা-দিগেব কাহারও উপরে শিখ গুরুর অপেক্ষা অধিকতব নিগ্রহ প্রদর্শন করা হয নাই। কিন্তু কি আশ্চর্য্য বীরত্ব, সপ্তশত লোকের মধ্যে একজনও স্বীয় ধর্ম্মবিশ্বাসকে কলঙ্কিত করিয়া শত্রুর অনুগ্রহভাজন হইলেন না। তাঁহাবা অগ্রে সম্মুখ-সংগ্রাম করিলেন, তৎপর অনুপম শৌর্য্য প্রকাশ করিয়া আনন্দ ধামে চলিয়া গেলেন! ইতিহাসে এরূপ জাতীয় বীরত্বেব পরিচয় অতি অল্প। এসংসাবে সাধনা ভিন্ন কিছুই হয় না। অশ্রুজল ভিন্ন আশালতা ফলবতী হয় না, শরীবের রক্তবিন্দু দান না করিলে কর্ম্মক্ষেত্র অভিষিক্ত হয় না। শিখদিগের ধর্ম্মজ্ঞান, চরিত্র বল ও আত্মত্যাগ নিস্ফল হয় নাই; উত্তরকালে নির্ম্মূল-প্রায় শিখ জাতিব মধ্যে আর এক মহাপুরুষ প্রাদুর্ভূত হইযা শিখমাহাত্ম্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই মহাপুরুষেব নাম রণজিৎসিংহ।

যাহারা ধর্ম্মান্ধতায় বা হটকারির মত শত্রু অস্ত্রে প্রাণ বিসর্জ্জন করে, তাহারা বীর বটে, প্রতিযোধের ভয়ের কাবণ বটে;

কিন্তু সমাজশক্তির স্তম্ভ নহে। আর যাহারা শাস্ত্রে বা শস্ত্রে সুশিক্ষিত হইয়া অক্ষৌহিণীর অধিপতিরূপে বীরত্ব প্রকাশের অবসর পায়, তাহাদিগেরও শক্তি বা চরিত্রের উপযুক্ত পরীক্ষা হয় না। কিন্তু শিবজী বা রণজিৎসিংহ সেইরূপ বীরপুরুষ নহেন। তাঁহারা আপনার শিক্ষা আপনি দিয়াছেন। হৃদয়ের স্বাভাবিক বল ও স্বোপার্জ্জিত অভিজ্ঞতাই তাঁহাদিগের একমাত্র সম্বল। সম্মুখে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী, অর্থ বা লোকবল কিছুই নাই। আপনার শৌর্য্যবীর্য্য, আপনার সাধনা ও চরিত্রবল দেখাইয়া পরাধীন ও পতিত জাতির মধ্যে এক বীরধর্ম্মান্বিত সাধারণতন্ত্র গঠন করিয়া তাহারই বলে জাতীয় মহত্ত্ব প্রতিষ্ঠিত করা সহজ ব্যাপার নহে। সমুদ্রে পতিত কোন ব্যক্তি সন্তরণ সহিষ্ণুতা ও সাহসের বলে যদি ভাসমান তৃণকাষ্ঠে ভেলা প্রস্তুত করিতে পারে, এবং তাহারই বলে যদি জলধির তরঙ্গাভিঘাত পরাস্ত করিয়া কূল পাইতে পারে, তাহা হইলে পৃথিবীর লোক কি তাহার ভূয়সী প্রশংসা না করিয়া পারে? মহাবীর রণজিতের শিখসমিতিকে বীরধর্ম্মে গঠন এবং তৎসহযোগে পুনঃ পুনঃ সংগ্রাম করিয়া শিখক্ষমতার প্রসার করণ, জগতের নিকট ততোঽধিক বিস্ময় কর

সন্দেহ নাই।

পঞ্জাবকেশরী রণজিৎসিংহ ইদানীন্তন কালের বীরসিংহ-দিগের অগ্রগণ্য। এত বুদ্ধি এত সাহস ও এত ক্ষমতা একাধারে প্রায় দেখিতে পাওয়া যায় না। লাহোর নগরে বীরসিংহ রণ-জিতের সমাধিমন্দিরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে, আজিও কল্পনাচক্ষে মূর্ত্তিমান বীরভাব সক্রামিত হইয়া নিদ্রিত হৃদয়কে সঞ্জীবিত করে। পর্ব্বতের পাষাণময় দেহ বিদীর্ণ করিয়া সামান্য অঙ্কুর যেমন প্রকাণ্ড তরুতে পরিণত হয়, যদি ইহলোকে কোন

মনুষ্যকে সেইরূপে মহত্ত্ব লাভ করিতে দেখিতে চাও, তবে রণজিতের ঘটনাপূর্ণ অদ্ভুত জীবনী পাঠ কর।

১৭৮০ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ লাহোরে সামান্য অবস্থায় জন্মগ্রহণ করেন; আর ১৭৯৮ খৃষ্টাব্দে রণজিৎ লাহোর প্রদেশের শাসনকর্ত্তা।। অষ্টাদশবর্ষীয় যুবক অথবা বালকের এত ক্ষমতা! পঞ্জাব প্রদেশ পূর্ব্বে দিল্লিপতির অধীন ছিল। ১৭৪৭ হইতে ৪৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যে মহম্মদসাহ আবদালি (ইহাঁর অন্য উপাধি দুরানি) ঐ প্রদেশ অধিকার করেন। ১৭৫১ খৃঃ অব্দ হইতে ঐ প্রদেশ মোগল সাম্রাজ্য হইতে ভিন্ন হইয়া আফগান সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। তদবধি রণজিতের প্রাদুর্ভাব পর্য্যন্ত ঐ প্রদেশ দুরানী বংশীয় সম্রাটদিগের রাজ্যভুক্ত ছিল। মহম্মদসাহ দুরানির পৌত্র জামানসাহ দুরানির সময়েই রণজিতের ভাগ্য প্রসন্ন হয়। স্বাভাবিক শক্তি সুযোগ পাইলেই প্রকাশ পায়। বিতস্তা নদীতে জামানসাহের কতকগুলি কামান পতিত হয়, রণজিৎ বহু কষ্টে সেই গুলির পুনরুদ্ধার করেন; তদবধিই দুরানি রাজের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠেন, এবং পরিশ্রম ও বীরত্বের পুরস্কার স্বরূপ উত্তরকালে পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তৃত্ব পদ প্রাপ্ত হয়েন।

একবার দাহ্য বস্তু স্পর্শ করিতে পারিলে, অগ্নি যেমন অল্প বিস্তৃতি লাভ করিয়া ক্ষান্ত হয় না, শক্তি ও পরাক্রমও সেইরূপ উপযুক্ত ক্ষেত্র বা উন্নতির সোপান পাইলে অল্পে প্রতিনিবৃত্ত হয় না। লাহোরের শার্দ্দূল শাসনকর্ত্তা ক্রমে পঞ্জাব প্রদেশে অদ্বিতীয় অধীশ্বর হইলেন। ১৮১৯ খৃঃ অব্দে দুরানি সম্রাটদিগকে বঞ্চিত করিয়া ভূলোকস্বর্গ কাশ্মীর হস্তগত করিলেন। পূর্ব্ব দিগে রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য শতদ্রুর পর পারে ইংরেজের মৈত্রীসূত্রে আবদ্ধ ভূপতিদিগকে ইতঃপূর্ব্বেই আক্রমণ ও ব্যতি-

ব্যস্ত করিয়াছিলেন। তার পর বহু বর্ষ পরে আবার ভারতের বৈজয়ন্তী সিন্ধুর পর পারে উড্ডীন করিলেন। যে ভয়ানক সংগ্রামে আফগান সাম্রাজ্য হইতে পঞ্জাব-কেশরী পেশোয়ার প্রদেশ কাড়িয়া লয়েন, সেই নওশেরার সংগ্রাম ভুমণ্ডলে বীর-কীর্ত্তির মধ্যে অগ্রগণ্য। ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে এই স্মরণীয় ঘটনা ঘটে। রঘুরাজ পার্থ ও বাপ্‌পারাও প্রভৃতি মহাবীরেরা যে বীরত্ব প্রকাশ করেন, ১৮২৩ খৃষ্টাব্দে রণজিৎসিংহ কাবুল নদীর তীরে নওশেরার রণক্ষেত্রে সেই বীরত্ব প্রকাশ করিয়াছিলেন। দুরন্ত ইউসফজীদিগের সঙ্গে শিখ সৈন্যের যে কি বিষম বিগ্রহ ঘটিয়াছিল, তাহা লেখনীযোগে কে বর্ণন করিতে পারে? রণজিতের ক্ষমতার তুলনা কোথায়? এক দিকে বৃটিশ-ক্ষমতা, অপরদিকে দুরন্ত আফগান জাতি, যদি যুগপৎ এই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীদ্বয় পঞ্জাবকেশরীর দুই দিকে বর্ত্তমান না থাকিত, তাহা হইলে শিখ সৈন্যের পদভরে ভুপৃষ্ঠ কতদূর প্রপীড়িত হইত, কে বলিতে পারে?

রণজিৎসিংহ কেবল পঞ্জাবকেশরী ছিলেন না, তিনি ভারতকেশরীও বীরকুলকেশরী ছিলেন। ইংরেজ চরিতা-খ্যায়কও কহিয়াছেন, "রণজিৎ সিংহ ছিলেন, সিংহের মতই ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছেন।" রণজিতের জীবনের আর একটী মাত্র কথার উল্লেখ করিতেছি। উত্তরাঞ্চলে পর্য্যটন সময়ে প্রায় শতবর্ষ বয়স্ক এক ব্রহ্মচারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। তিনি সংস্কৃত শাস্ত্রে বিশারদ, ইংরেজী জানেন, পাশ্চাত্য ইতিহাস ও দর্শনাদি অধ্যয়ন করিয়াছেন। তিনি বহুদর্শী ও সহৃদয়, সমগ্র ভারতবর্ষ পর্য্যটন করিয়া ভারতে-তিহাসের অনেক কাণ্ড স্বয়ং প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। ভারতের প্রসঙ্গ করিতে গেলেই তাঁহার হৃদয় ভাবে পরিপূর্ণ হইয়া

উঠে। ' তিনি বাঙ্গালি, এই প্রস্তাব লেখকের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা করিলেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি এতাধিক পরিচয় কিছুই প্রদান করিলেন না। রণজিৎ সিংহের জীবনের যে একটী ঘটনা তিনি প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, তাহা এই।—

যৎকালে ইংরেজদিগের সঙ্গে রণজিৎসিংহ সন্ধিবদ্ধ ছিলেন, তখন একবার তৎকালীন রাজপ্রতিনিধি লর্ড অকলাণ্ড রণজিতের রাজধানীর সন্নিধানে শিবির সংস্থাপন করেন। রাজপ্রতিনিধির সঙ্গে কতক সৈন্য ও প্রধান সৈন্যাধ্যক্ষ ছিলেন। রণজিত সিংহের নিয়ম ছিল, তিনি প্রত্যহ প্রত্যূষে উঠিয়া অশ্বারোহণে নগর ও সৈন্যাদি পরিদর্শন করিতেন, বেলা এক প্রহর হইলে অর্থাৎ নয়টা বাজিলেই রাজভবনে প্রতিগমন করিতেন। এক দিন ভ্রমণ করিতে করিতে একাকী বৃটিশ শিবিরে প্রবেশ করিলেন, রাজপ্রতিনিধি অতি সমাদরে পঞ্জাবরাজকে গ্রহণ করিলেন; বিবিধরূপ আলাপ হইতে লাগিল। রণজিৎ একটুকু অন্তর হইলে প্রধান সেনাপতি রাজপ্রতিনিধিকে কহিলেন "রণজিৎসিংহ সাহসী যোদ্ধা বটেন, কিন্তু অবিবেচক, এইরূপে অসহায় হইয়া পর শিবিরে প্রবেশ করা যুক্তিসিদ্ধ নহে।" রাজ প্রতিনিধি কহিলেন, "রণজিৎ সম্বন্ধে এরূপ সিদ্ধান্ত করাই অবিবেচনার কার্য্য।

বৃটিশ শিবির পরিভ্রমণে ও নানাবিধ কথাপ্রসঙ্গে বেলা অধিক হইল। রণজিৎ গৃহে গমন করিলেন না দেখিয়া তাঁহার অনুচরেরা উৎকণ্ঠিত হইলেন; নগরময় মহা হুল স্থূল পড়িয়া গেল। ক্রমে প্রকাশ পাইল, পঞ্জাবরাজ বৃটিশ শিবিরে প্রবেশ করিয়াছেন। তাঁহার কোন অমঙ্গল ঘটীয়াছে, এইরূপ আশঙ্কায় শিখ সৈন্য সজ্জিত হইল। শিখ সৈন্যের এমন শিক্ষা, রণজিতের

এমন প্রভাব, আর তাঁহাব সৈন্যেরা এমনই প্রভুভক্ত যে, মুহূর্ত্ত মধ্যে আসিয়া পিপীলিকাশ্রেণীবৎ বৃটীশ শিবির বেষ্টন করিতে উদ্যত হইল। কিন্তু পবক্ষণেই জানিতে পারিল যে রাজা কুশলে আছেন, আর অমনি সকলে স্ব স্ব স্থানে প্রস্থান করিল। রণজিৎ গৃহে গমন করিলে রাজপ্রতিনিধি প্রধান সেনাপতিকে কহিলেন, "শিখসৈন্যের অবস্থা দেখিলেন ত? রণজিৎ বীরপুরুষ, তিনি আত্মবল না বুঝিয়া কোন কর্ম্ম করেন না, যদি এ সময়ে রণজিতের অঙ্গে হস্ত প্রদান করিতেন, তাহা হইলে হয় সমস্ত শিখসৈন্য এখানে প্রাণ দান করিত, না হয় বৃটিশ শিবির ধ্বংশ করিয়া ফেলিত।" সেনাপতি অবাক্ হইয়া রহিলেন।

প্রস্তাব দীর্ঘ হইয়া পড়িতেছে, কিন্তু স্মৃতির কুহক অতিক্রম করিতে পারিতেছি না। মনে হয়, কল্পনাচক্ষে নিরন্তর ভূত-কীর্ত্তির চিত্র দেখিয়া বর্ত্তমান বিস্মৃত হইয়া থাকি। হা পুণ্য-ভূমি ভারতবর্ষ, তোমার এই ভূমিতে কত কত মহাযোগী তপস্যা করিতে করিতে লীন হইয়াছেন, কত কত সতীর চিতানলে এই ভূমি পবিশুদ্ধ হইয়াছে, কত কত বীরপুরুষের হৃদয়-শোণিতে এই ভূমি অভিষিক্ত হইয়াছে। তবে কেন তোমার এই দশা? তবে কেন দুঃখ দরিদ্রতা ও পাপ কাপুরুষতা তোমাকে কলঙ্কিত করিয়া রাখিয়াছে? আর এক বারও কি তুমি জাতীয় মহত্বে সমুজ্জ্বল হইয়া পৃথিবীর নিকট হাস্য করিবে না!

পবিবারবন্ধন ও পারিবাবিক সুখ।

পবিবার-বন্ধন প্রথা মানবজাতির সুখ ও সম্পদের নিদান স্বরূপ। পাবিবাবিক সম্বন্ধই মানবজীবন ও পশুজীবনে প্রভেদের পরিচায়ক; পারিবাবিক দায়ীত্বই মানব চরিত্রে পশুভাব খর্ব্ব কবিয়া দেব ভাব সম্বর্দ্ধিত কবে। এ সংসাবে যাহার পবিবার নাই, তাহাব চবিত্রেব মাহাত্ম্যেব পরীক্ষার উপযুক্ত স্থল নাই। এ সংসাবে যাহাকে কেহ "আমার" বলে না, তাহার মত হতভাগ্য আর কেহ নাই। মানুষের পরিবার সত্য সত্যই তদীয় সুখ ও সম্পত্তিব ক্রীড়া-ভূমিস্বরূপ। পরিবার মানুষের অন্তরে বলও শান্তি প্রদান কবে। নিয়মিতরূপে কার্য্য করিতে থাকিলে অস্ত্রের যেমন মলিনতা ঘুচিয়া যায়, পরিবারের পরিচর্য্যা কবিয়াও মানব চবিত্র সেইরূপে উৎকর্ষ লাভ করে।

অনন্যসাধারণ মহাজনগণেব কথা স্বতন্ত্র। যাঁহাদিগেব হৃদয় প্রীতিব ভাণ্ডার স্বরূপ, যাহাবা যথার্থ জ্ঞানালোকে দিব্য চক্ষু লাভ করিয়া বসুধাকে আপনাব মনে করিতে পারেন, যাঁহারা আত্মপব গণনা বিস্মৃত হইয়াছেন, যাঁহারা সাধনার বলে পবিত্রতা, সহিষ্ণুতাও কার্য্যশীলতা হস্তগত করিয়াছেন, এ সংসারে শোণিতের সম্বন্ধ বিস্তাব করা তাঁহাদিগের পক্ষে তত প্রয়োজনীয় না হইতে পারে। কেননা তাঁহারা স্বজাতি, স্বদেশ বা সমস্ত পৃথিবীকে এক পরিবার মনে করিয়া তাহারই পরিচর্য্যায় আত্মসমর্পণ করিতে পাবেন। কিন্তু জগতে সেইরূপ রমণীরত্ন সেইরূ পুরুষশ্রেষ্ঠ অতি দুর্লভ।

পরিবার-বন্ধন মানুষেব কর্ত্তব্য পালনের উপকরণ হইয়া সমাজের মঙ্গল সাধন কবে। মনুষ্যের শক্তি সামর্থ্য অতি সামান্য ও সীমাবিশিষ্ট, কিন্তু সমাজেব প্রয়োজন ও সামাজিক

কর্ত্তব্যের পরিসর অনন্ত। যদি জন সমাজের সকল মনুষ্যের উপরেই অনির্দ্দিষ্টরূপে সমগ্র সমাজের প্রয়োজন সাধনের ভার থাকিত, যদি লোক মাত্রেরই উপরে নির্ব্বিশেষে বৃদ্ধের পরিচর্য্যা শিশুর লালনপালন ও বালকের শিক্ষার ভার থাকিত, তাহাহইলে জনসমাজ এত দিনে উৎসন্ন হইয়া যাইত, এখন সমাজে যে দুঃখ ও দারিদ্র্য রহিয়াছে, ইহার শতগুণ বৃদ্ধি পাইত। নির্দ্দিষ্ট দায়ীত্ব না থাকাতে অধিকাংশ মনুষ্য উচ্ছৃঙ্খল প্রকৃতি হইত। অভাব ও উপায় এবং প্রয়োজনত্ত ও প্রয়োগের সমতা রক্ষা না হইয়া, সক্ষমেরা অলস ও স্বেচ্ছাচারী হইত, এবং অক্ষমেরা সমাজের ঘোরতর গলগ্রহ হইয়া অভাব ও অনাদরে প্রাণে মরিত। মানুষের শক্তি অনুসারে কার্য্যক্ষেত্রের বিস্তারের প্রয়োজন। পরিবারবন্ধন মানব সমাজের সংসার সাধনের এবং সমাজের বন্ধন ও কল্যাণের উপায় স্বরূপ; একদিকে আলস্য ও উচ্ছৃঙ্খলতা, অপর দিকে অসহায়তা নিবারণের হেতু স্বরূপ।

কিন্তু সমাজের এই প্রয়োজন কি পরিবারবন্ধন ভিন্ন সাধিত হয় না? সমাজের প্রতি কর্ত্তব্যভার ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তির বা সমিতির উপরে বিভাগ করিয়া দিলে কি সমাজের এই কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না? উন্নতিশীল মানবসমাজে স্বাধীন চিন্তার প্রাদুর্ভাবে এরূপ প্রশ্ন মানবের মনে উদিত হওয়া অস্বাভাবিক নহে। জনসমাজ অনন্ত উন্নতি শীল। মানবের বুদ্ধি প্রমাদশূন্য এবং মানবের চরিত্র দোষস্পর্শশূন্য নহে। এই জন্য জ্ঞান ও সভ্যতার উন্নতি কালেও মনুষ্যসমাজে এবং মানব পরিবারে দুঃখ বিড়ম্বনার ইয়ত্তা নাই। এই দুঃখ যন্ত্রণায় উদ্বেজিত হইয়া যদি কেহ মনে করেন যে, অন্য কোন প্রকারে সমাজ বন্ধন করিলে, বর্ত্তমান পরিবারবন্ধন প্রথার পরিবর্ত্তন করিলে ভাল হইত,

তাহাকে ভ্রান্ত মনে কবিতে হইবে। তাহাব কল্পনা কস্মিন্‌কালেও কার্য্যে পবিণত হইতে পাবে না ; অবস্থা শক্তি ও রুচি অনুসাবে প্রতি ব্যক্তিব উপবে সামাজিক কর্ত্তব্যের ভাব বিভাগ কবিয়া দেওয়া আকাশকুসুমবৎ অসম্ভব। ঐইরূপ নির্দ্ধারণ ও তদনুরূপ নির্ব্বাচন লৌকি বুদ্ধিব অগম্য।

অতএব স্বভাবেব অনুবর্ত্তন কবা মানুষেব কর্ত্তব্য। স্বাভাবিক দাম্পত্য প্রেমে সম্বদ্ধ হইযা, ও সংসাবে শোণিতসম্বন্ধ বিস্তার্ব কবিতে দিযা যে সমাজেব লোকও প্রযোজনেব বিভাগ হয়, ইহাই স্বাভাবিক। ইহারই নাম পরিবাব বন্ধন। পবিবাব বন্ধনে প্রাকৃতিক নিযমে কতগুলি লোক এক ও স্বতন্ত্র হইয়া পড়ে। সেই সকল লোক স্বেচ্ছায পবস্পবেব জন্য দায়ীত্ব ভার গ্রহণ কবে ; অতিবিক্ত পবিশ্রমেও যদি পবিবাবেব পবিচর্য্যা কবিয়া উঠিতে না পাবে, ধবাতলে কাহাকেও অনুযোগ দিতে পাবে না। মানুষেব দুর্ব্বলতা, সমাজেব অবিবেচনা প্রভৃতি বশতঃ পাবিবাবিক বিডম্বনা নিবারিত হইতে পাবে না বলিয়া, যাহাবা জীবনকে ভাববহ মনে কবে, এবং অনন্ত মঙ্গলময় পবমেশ্ববের সৃষ্টিকার্য্যে দোষাবোপ কবিতে সাহসী হয, তাহারা যার পর নাই অসহিষ্ণু ও অল্পদর্শী।

পবিবাব মানুষের প্রাণে শান্তি ও হৃদযে বল প্রদান কবে। প্রীতি ও পবিচর্য্যাব বিনিময়ই ইহাব কাবণ। জল যেমন বাষ্প হইয়া ঊর্দ্ধদিকে গমন কবে, এবং শিলা হইয়া নিম্নে পতিত হয়, এক প্রীতিও সেইরূপ ভক্তিরূপে পরিণত হইযা গুরুজনকে এবং স্নেহ রূপে পবিণত হইযা অপত্যাদিকে আলিঙ্গন কবে। পবিবারের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠে পতিপত্নীতেও সহোদব সহোদবায় প্রীতিব এইরূপে বিনিময হয, এবং এই প্রীতিব বন্ধে অযাচিত রূপে একে অন্যেব পবিচর্য্যা কবে। প্রীতি এবং পবিচর্য্যাব

এইরূপ বিনিময় যদি না থাকিত, তবে মানুষের দুঃখের সীমা থাকিত না। জনক জননী যদি নিঃস্বার্থ প্রীতির বশে সন্তানের মঙ্গল কামনা, লালন পালন ও শিক্ষাদান না করিতেন, সন্তান যদি অহৈতুকী ভক্তির বশে পিতা মাতার পরিচর্য্যা না করিত, স্নেহ ও কোমলতার প্রতিমূর্ত্তিরূপা ভগিনী যদি রোগশয্যায় ভ্রাতার শুশ্রূষা না করিত, পতি যদি কেবল প্রেমের অনুরোধে পত্নীর সুখে আত্মবিসর্জ্জন না করিতেন, পত্নী যদি পৃথিবীর সমস্ত আকর্ষণ ও উপরোধ উপেক্ষা করিয়া বনে বনে পতির দুঃখ-ভাগিনী না হইতেন, তবে এ সংসার ঘোরতর শ্মশান এবং দুঃখ ও হাহাকারের অভিনয় স্থল হইত। সুখ ও দুঃখের অংশী যদি জগতে কেহ না থাকে, তাহা হইলেও মানুষ জীবিত থাকিতে পারে না। অকৃতকার্য্য হইলে আমার সঙ্গে সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া, আমার কার্য্যের ফলভোগী হইয়া, আমার দুঃখের উপ-শম করিবার জন্য যদি সংসারে কেহ না থাকে, তবে আমার হৃদয় দুঃখভারে ভাঙ্গিয়া পড়িবে। বহু পরিশ্রম বহু পর্য্যটন বা উৎকট কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইয়া গৃহে আসিলে, যদি প্রসন্ন দৃষ্টিতে কেহ আমার মুখের দিকে না তাকায়, যদি কেহ আমার উৎসাহ ও তৃপ্তির ভাগী না হয়, তাহা হইলে সৎকার্য্যে ও সাধনায় আমার অনুরাগের হ্রাস হইবেই হইবে।

পরিণয়-প্রথা পরিবার গঠনের মূল ও মানুষের সংসার-বন্ধনের সেতু স্বরূপ। এই পরিণয়প্রথার বিশুদ্ধতা ও পরিণয় কার্য্যের বল ও সৌন্দর্য্যের উপরেই পারিবারিক সুখ ও মঙ্গল সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। পরিণয় কার্য্য মানব হৃদয়ের স্বাভা-বিক আকাঙ্ক্ষার ফল, এবং মানবের প্রেম সহিষ্ণুতা ও পবিত্রতা শিক্ষার অমোঘ উপায় স্বরূপ। যাহারা অস্বাভাবিক ভাবে পরিণয় কার্য্য সমাধা করে, স্বার্থ কি সৌকর্য্য-সাধন অথবা ইতর

ইন্দ্রিয়াসক্তির চরিতার্থতার জন্য বিবাহ করে, তাহারা প্রকৃত পরিণয়রূপ পবিত্র অনুষ্ঠানের স্বর্গীয় সুখে ত বঞ্চিত হয়ই, তাহাদিগের পরিবারবন্ধনও পরিণামে বিবিধ বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হইয়া যায়।

৫

এ সংসারে নারীপ্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতি বিধাতার দুই বিচিত্র সৃষ্টি। এই উভয় প্রকৃতিই অনুপম স্বতন্ত্র সৌন্দর্য্যের আধার, অথচ পরস্পরের একান্ত পক্ষপাতী। পুরুষের শরীর যেমন বলিষ্ঠ কর্ম্মঠ ও উন্নত, নারীদেহ তেমনই সুগোল সুকোমল ও লাবণ্যে পরিপূর্ণ। পরন্তু স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই চক্ষু বিধাতা এমন আশ্চর্য্য উপাদানে প্রস্তুত করিয়াছেন যে, উভয়েই পরস্পরকে অধিকতর সুন্দর দেখে। আবার স্ত্রীপুরুষের অভ্যন্তরও সেইরূপ। পুরুষপ্রকৃতি সাহস সামর্থ্য ও দৃঢ়তা প্রভৃতি গুণের আধার, আর নারীপ্রকৃতি কোমলতা স্নেহ ও সহিষ্ণুতা প্রভৃতি গুণের ভাণ্ডার। অথচ উভয়েরই অন্তর এমন চমৎকার উপকরণে গঠিত যে, উভয়ে পরস্পরকে আকাঙ্ক্ষা করে, পরস্পরকে অতি শ্রেষ্ঠ সম্ভোগ্য ও প্রার্থনীয় মনে করে; উহাদিগের মধ্যে এমনই আশ্চর্য্য সম্বন্ধ যে, পরস্পরকে উভয়েই আলিঙ্গন করিতে, পূজা ও পরিচর্য্যা করিয়া কৃতার্থ হইতে চায়। সুকোমল পুষ্পদলে অবস্থিত থাকিয়া দুইটী শিশিরবিন্দু যেমন পরস্পরকে আকর্ষণ করে, এই উভয় প্রকৃতিও সেইরূপ পরস্পর প্রাণে প্রাণে মিলিয়া এক হইতে চায়। পর্ব্বতবক্ষ হইতে বিনির্গত হইয়া দুইটী জলস্রোত যেমন সমভূমিতে আসিয়া পরস্পর মিলিত হয়, এবং উভয়ে এক হইয়া শক্তি ও সৌন্দর্য্য বিস্তার করিতে করিতে সাগরাভিমুখে ধাবিত হয়, এ সংসারে রমণী ও পুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়াও সেইরূপ ক্রমে লালিত পালিত ও সম্বর্দ্ধিত হয়, এবং শুভ পরিণয়যোগে সম্বদ্ধ হইয়া অনন্ত উন্নতি ও সুখের দিকে গমন করে।

অবস্থা, শিক্ষা ও রুচি অনুসারে একটী রমণীহৃদয় যে আর একটী পুরুষ হৃদয়ের সঙ্গে মিলিত হয়, একটী পুরুষ যে অপর একটী রমণীকে আপনার বলিয়া গ্রহণ করে, তাহা বই আর কিছু জানে না; এবং তাহার পরিচর্য্যা করিয়াই চরিতার্থ হয়, ইহারই নাম বিবাহ। এইরূপ বিবাহই জাহ্নবী যমুনার সঙ্গমের মত পুণ্য ও শান্তির কারণ হয়। দাম্পত্য প্রেমের এক লক্ষণ এই, উহা এক ভিন্ন দুই জানে না। প্রকৃত দাম্পত্য প্রেমের অনুরোধে যখন দুই হৃদয়ের বিনিময় হয়, তখন উভয়েই কেবল আত্মবিস্মৃত হইতে থাকে, অনন্যমনা হইয়া—তদ্গত হইয়া, প্রাণের সমস্ত আকাঙ্ক্ষা এক পদার্থের প্রতিই বিনিযোগ করে, এবং প্রাণের সেই প্রিয় পদার্থের পরিচর্য্যাতেই অনুপম স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে থাকে। যাহারা বহু বিবাহরূপ অস্বাভাবিক ও অপ্রকৃত পরিণয়-পাপে দূষিত হইয়াছে, তাহারা দাম্পত্য প্রেমের এই নির্ম্মল ও নিরুপম সুখে বঞ্চিত হইয়া রহিয়াছে।

পরিণয় বিশুদ্ধ এবং সুখ ও মঙ্গলপ্রদ করিতে হইলে, দম্পতির মধ্যে স্বাধীনতা পবিত্রতা ও যোগ্যতা চাই। নারী প্রকৃতি ও পুরুষপ্রকৃতির সম্মিলনে মানবসমাজে এক দেবভাবের জন্ম হয়। সেই দেবত্ব লাভ ও সেই অপার্থিব সম্পদ-প্রাপ্তি ও সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির জন্য, মানবের চিত্ত স্বভাবতঃই লালায়িত। ইহারই নাম স্বাভাবিক প্রেম। এই স্বাভাবিক প্রেমের বশবর্ত্তী হইয়া যে বিবাহ হয়, তাহাই প্রকৃত পবিত্র পরিণয়। তদ্ভিন্ন ইন্দ্রিয়াসক্তি বা সাংসারিক সৌকর্য্য-সাধন মানসে যে বিবাহ হয়, তাহা বিবাহ নহে,—বিবাহের নামে অতি নিন্দনীয় পাশব সম্মিলন বই আর কিছুই নয়। এরূপ নীচ ও নিকৃষ্ট পরিণয়প্রথা যে পরিবার বন্ধনের ভিত্তি, সেই পরিবার মানবের ভোগ্য উচ্চ ও উন্নত সুখের আস্বাদ স্বপ্নেও পাইতে পারে না।

পবিণয়েব পবিত্রতা বক্ষাব জন্য যেমন স্বাভাবিক প্রেমেব প্রয়োজন, সেইরূপ আবাব নবনাবীব স্বাধীন নির্ব্বাচনাধিকার থাকাও আবশ্যকীয়। যাহাব সঙ্গে মিলিত হইয়া জীবন যাপন কবিতে হইবে, যাহাব সঙ্গে এক হইয়া চিবদিন সুখ ও দুঃখেব ভাগী হইতে হইবে, যাহাব ইহ পবকালেব মঙ্গলামঙ্গল স্বকীয় ইহ পবকালেব মঙ্গলামঙ্গলেব সঙ্গে অভিন্ন, তাহাকে স্বয়ং নির্ব্বাচন কবা আবশ্যক। এমন অধিকাব যাহাকে দিতে হইবে,- আপনাব হৃদপিণ্ড অপেক্ষা যাহাকে অধিক যত্ন কবিতে হইবে, আপনাব দক্ষিণহস্ত হইতেও যে অধিক সহায় হইবে, যাহাব প্রসন্ন মুখ নিবীক্ষণ কবিয়া অন্তবে শান্তি ও স্ফূর্ত্তিব উদ্রেক হইবে, যাহাব মনোমালিন্যে সংসার অন্ধকাবময় দেখিতে হইবে, যাহাব সাধু ব্যবহাবে স্বর্গেব পথ পবিষ্কৃত হইবে, আব যাহাব পাপাচাবে নরকভয় সঞ্চিত হইবে,—এমন অধিকার যাহাকে দিতে হইবে, তাহাকে স্বয়ং নির্ব্বাচন কবা আবশ্যক। এ কার্য্যেব প্রতিনিধি আব কেহ হইতে পাবে না। আত্মীয় কুটুম্ব বন্ধু বান্ধব অথবা সমগ্র মানব সমাজ এ কার্য্যেব ভাব লইতে পাবেন না। কাহাকেও অযথা অনুবাগে উন্মত্ত দেখিলে, অথবা অসঙ্গত সম্বন্ধ স্থাপনে উদ্যত দেখিলে, সদুপদেশ দান কবিতে পাবেন, সতর্ক কবিতে পাবেন, কিন্তু তাহাব হইয়া সেই কার্য্য কবিতে পাবেন না। মনুষ্য মাত্রেবই মুখাকৃতি যেমন বিভিন্ন, সেইরূপ চিত্তেব গঠন অর্থাৎ মনের বল এবং হৃদয়ের ভাবও সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যাহাদিগের হৃদয়-মনেব ভাবগতি অত্যন্ত বিসদৃশ, তাহাদিগেব একত্র মিলন যে অনিবার্য্য দুঃখ ও নানা বিড়ম্বনার আকর, তাহা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। যাহাবা দেশাচাব বশং বা পদমর্য্যাদা, খ্যাতি প্রতিপত্তি বা অর্থসঙ্গতিব মুখ চাহিয়া বিবাহ বিষয়ে নবনাবীব স্বাধীন নির্ব্বাচন

কার্য্যে বাধা দেয়, তাহারা সমাজের গুরুতর শত্রু। তাহাদিগের যদি দায়ীত্ব জ্ঞান থাকিত, তাহাদিগের যদি হৃদয় থাকিত, তাহা হইলে তাহারা কদাপি এরূপ পাপভাগী হইতে সাহসী হইত না।

স্বাধীনতা ও পবিত্রতার সঙ্গে সঙ্গে পরিণয় কার্য্যে দম্পতির উপযুক্ততা অবশ্য প্রয়োজনীয়। অনুপযুক্তের পক্ষে বিবাহসম্বন্ধে বদ্ধ হওয়া অনন্ত অসুখের নিদান। পাত্র বিশেষে ও অবস্থা বিশেষে উপযুক্ততার গণনা হইয়া থাকে। যে সময়ে মানুষের যৌবনচাঞ্চল্যের উপশম হয়, জ্ঞান বুদ্ধির বিকাশ হয়, এবং দায়ীত্ব বোধ জন্মে, যে সময়ে মানুষ শিক্ষিত ও উপার্জ্জনক্ষম হয়, যে সময়ে পরিবার-বন্ধনের মূল্য বুঝিতে ও পতি বা পত্নীর মর্য্যাদা রক্ষা করিতে, এবং সন্তান পালন করিতে পারে, যে সময়ে সন্তান হইলে রোগ শোক ও দারিদ্র্যের বৃদ্ধি হয় না, তাহাই পরিণয়ের প্রকৃত সময়। অকালে বিবাহিতেরা অস্থানে রোপিত বৃক্ষের মত জীবন্মৃত হইয়া থাকে। বিবাহ শব্দের অর্থ বিশেষ ভাবে ভার গ্রহণ করা। দম্পতি বিবাহ সম্বন্ধে আবদ্ধ হইলেই যদি পরস্পরের শারীরিক মানসিক পারিবারিক এবং ঐহিক ও পারলৌকিক মঙ্গলের সহায় হইতে পারে, তবেই তাহাকে প্রকৃত বিবাহ বলে। জলস্থলের যে সম্বন্ধ, স্বামীস্ত্রীর সেইরূপ সম্বন্ধ। উত্তাপ এবং আলোকের সংযোগে যেমন জগতের কার্য্যসাধন ও সৌন্দর্য্যবৃদ্ধি হয়, প্রকৃত বিবাহ সম্বন্ধে নরনারীর সম্মিলনও সেইরূপ সংসার-সাধন ও সংসারের সৌন্দর্য্যবৃদ্ধির কারণ হয়।

পরিবার সাধন ও পারিবারিক সুখ লাভের সচরাচর কতকগুলি অন্তরায় ঘটে। পারিবারিক সুখের মূলোৎপাটন ও পরিবার-বন্ধনের শিথিলতা চরিত্রদোষে যেমন হয়, এমন আর কিছুতেই

হয় না। ব্যভিচারই মনুষ্য-পরিবারের পবিত্রতাকে মলিন করিয়া মানুষকে পশুবৎ করে। যে পরিবারে পুরুষ পশু ইন্দ্রিয়াশক্তির দাস হইয়া ছাগমেষাদির মত ব্যবহার করে, যে পরিবারেব কুলকামিনী নারী-চরিত্রের দেবভাব ধৈর্য্য ও চিত্তসংযমে জলাঞ্জলি দিয়া কুপথগামিনী হয়, সেই পরিবারে কি আর পবিত্র বন্ধন ও সুখ থাকিতে পারে? দুশ্চরিত্র পতির ব্যবহারে পবিণীতা পত্নীর হৃদয়ে যে অনিবার্য্য দুঃখানল জ্বলিতে থাকে, পুরস্ত্রীর পতনে পিতা ভর্ত্তা প্রভৃতি প্রিয়জনের অন্তরে যে দুর্নিবার ক্ষোভাগ্নি প্রজ্বলিত হয়, সেই হুতাশনে পরিবারের সকল শান্তি দগ্ধ হইয়া যায়। স্বর্গের স্থানে নরকের সৃষ্টি হয়, সরলতা শান্তি ও প্রীতির স্থানে সংশয় বিদ্বেষ ও অশান্তি উপস্থিত হয়। কত শত লোক চিরকলঙ্কের ডালি মাথায় লইয়া, কোথাও আত্মহত্যা বা প্রাণদণ্ড করিয়া এই মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করিয়া থাকে।

মাদক সেবন পারিবারিক সুখের গুরুতর অন্তরায়। মাদক সেবনে বিবিধরূপে পরিবারের ক্ষতি করিয়া থাকে। প্রথমতঃ উহাতে পরিবারে অমিতব্যয়িতা ঘটায়; মাদকসেবী অক্ষম হইয়া আশানুরূপ চিন্তা বা পরিশ্রম করিতেও পারে না। দ্বিতীয়তঃ মাদকসেবা চরিত্র-শিথিলতার প্রায় নিত্যসহচর। তৃতীয়তঃ উহাতে পরিবারকে রোগ শোক ও অকালমৃত্যুর ভাগী করে। যাহারা মাদকসেবা করিয়া-অকর্ম্মণ্য ও নরকপথের পথিক হয়, এবং সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পরিবারবর্গকে পথের ভিখারী করিতে কুণ্ঠিত হয় না, তাহারা স্বকীয় পরিবার ও জনসমাজের পরম শত্রু। যদি তাহারা আপনার পুত্রপৌত্রাদিকে বিষপান করাইয়া ক্রমে ক্রমে চিররোগী করিত, কিম্বা যদি আপনার গৃহে আপনি অগ্নিপ্রদান করিয়া বৃক্ষতল আশ্রয়

করিত, তাহা হইলেও অধিকতর নিন্দনীয় বা পাপভাগী হইত না। ইচ্ছাপূর্ব্বক কোন অপকার্য্য করিলে কেহ যেরূপ দায়ী হয়, ইচ্ছা করিয়া কোন কুঅভ্যাস করিয়া, তৎপবে সেই অভ্যাসেব বশে সেই অপকার্য্য করিলেও তদ্রূপ দায়গ্রস্ত কেন না হইবে ?

পক্ষপাত পব-মুখ-প্রেক্ষীতা ও অনুচিত সঙ্কোচ, এই তিন দোষে বঙ্গীয় প্রায় প্রত্যেক ভদ্র পরিবার গুরুতর অমঙ্গল ও অসুখেব নিদান হইয়া রহিয়াছে। কর্ত্তব্যজ্ঞানের অভাবেই পক্ষপাতের জন্ম। অন্তরেব ভাবগতি একরূপ অথবা ব্যবহার প্রিয়তব, এই জন্য পবিবার মধ্যে এক ব্যক্তি অপর কোন এক ব্যক্তিব প্রতি অধিকতব প্রীত ও প্রসন্ন হইতে পাবে, কিন্তু সকলেব কর্ত্তব্যজ্ঞান একপ পরিস্ফুট নহে যে, কার্য্যকালে সকলের প্রতি সমান বা সন্যায় ব্যবহার কবিতে পারিবে। সুতরাং পরিবার মধ্যে আহারে ব্যবহাবে পর্য্যন্ত পক্ষপাত দৃষ্ট হইয়া থাকে। পক্ষপাত মানুষকে এমনই অন্ধ করিযা ফেলে যে, জনক জননী পর্য্যন্ত স্বীয় সন্তানদিগের মধ্যে একের দোষ গোপন ও অপরের দুর্ণাম রটনে সন্তুষ্ট হয়েন। পক্ষপাতের বশবর্ত্তী হইয়া যাহার প্রতি অন্যায ব্যবহার করা যায, তাহাব মনে অসন্তোষ জন্মিতে থাকে, সেই অসন্তোষ ক্রমে পক্ষপাতীর প্রতি অশ্রদ্ধা, ও যাহার প্রতি পক্ষপাত হয, তাহার সঙ্গে অনর্থক প্রতিযোগীতায়, এবং অবশেষে পক্ষপাতী গুরুজনেবও প্রতি গভীর ঘৃণা ও যাহার প্রতি পক্ষপাত হয় সে সহোদর হইলেও তাহার প্রতি অযাচিত বিদ্বেষে পবিণত হয়। পক্ষপাতের আর এক মহাদোষ এই যে, পরিবার মধ্যে রাম যদি শ্যামের পক্ষপাতী হয়, আর যদু যদি হরিব পক্ষপীত হয, তাহা হইলে কেবল সেই কারণেই অনেক সময়ে রাম ও যদুতে মনোভঙ্গ হইয়া থাকে।

অন্যায সঙ্কোচের মত অসুখকব পরিবার মধ্যে আর কিছুই নাই। স্বাধীনতার মত প্রিয় পদার্থ মানুষের আর কি আছে? পরিবার মধ্যে সেই স্বাধীনতার কত প্রয়োজন। যে যাহাকে ভক্তি করে, সে যদি স্বাধীনভাবে না করে,যে যাহাকে স্নেহ করে, সে যদি প্রাণ খুলিযা তাহার প্রতি সস্নেহ ব্যবহার করিতে না পাবে, স্বাধীন ভাবে অকুণ্ঠিত চিত্তে, কোন বাধা বিঘ্ন না পাইযা যদি পরিবাবের লোকেরা পরস্পর প্রীতি ও পরিচর্য্যা করিতে না পারে, তাহা হইলে কি তাহাদিগের অন্তরে স্ফূর্ত্তি ও আনন্দ বিরাজমান থাকিতে পাবে? ভযে ভযে, চক্ষু লজ্জায বা নিন্দার ভযে কপট সাজিযা পরস্পরের প্রতি ব্যবহার করিতে বাধ্য হইলে, পরিবার কারাগারবৎ ক্লেশের কারণ হয়। পরিবারের মধ্যে অভিভাবকেরা অনেক স্থলেই অনুচিত আধিপত্য-প্রিয। তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষা যে, পরিবার মধ্যে কেহ যেন চুল প্রমাণও তাহাদিগের ইচ্ছার ব্যতিক্রম না করে। তাহারা পত্নীর সঙ্গে পরামর্শ করা পুরুষার্থের হানিকারক মনে করে, উপযুক্ত পুত্র কন্যাকেও হস্তের পুত্তলের মত বিবেচনা করে, আর ভৃত্য ও অধীনস্থদিগকে সদর্প আদেশ ভিন্ন আর কিছু করা, স্বকীযপদের অনুচিত জ্ঞান করে। তাহারা বড় হতভাগ্য। পারিবারিক নির্ম্মল সুখ তাহাদিগের ভাগ্যে ঘটে না। পরিবার ইক্ষু দণ্ড নহে যে, পেষণ করিযা উহা হইতে সুখলাভ করা যাইতে পারে; মানবের স্বাধীনতা, সরলতা ও প্রীতিই পারিবারিক সুখের নিদান।

অস্বাভাবিক শিক্ষাও এই অন্যায় সঙ্কোচের কারণ। অনেক পরিবারেই পিতামাতা ও সন্তানে মন খুলিযা কথা বলা হয না; ভ্রাতা ভগিনী একত্র হইয়া বিশুদ্ধ আমোদ আহ্লাদ সম্ভোগ করিতে পারে না; পতি পত্নীকে অনুবর্ত্তিনী, ও পত্নী পতিকে

প্রতিপালক জ্ঞান করিয়া থাকেন। হতভাগ্য বঙ্গভূমি অস্বাভাবিকতা ও পবিতাপের ক্রীড়াভূমি হইয়া পড়িয়াছে! এ দেশে সহধর্ম্মিণীকে সাদর সম্ভাষণ করিলে উপহাসাস্পদ হইতে হয়, পতিপ্রাণা সতী পতিবিয়োগে প্রাণ খুলিয়া ক্রন্দন করিয়া শোকাবেগ সমিত করিলে নিন্দিত হয়েন। বিদেশ-গমনোদ্যত প্রিয় পুত্রকে জনক জননী একযোগে আশীর্ব্বাদ করিতে পারেন না। পবিণয়-সম্বন্ধকে অপবিত্র নেত্রে দেখাই এই মহাপাপের কারণ। কোন কোন স্থলে বঙ্গের কুলকামিনীগণ স্বজন সমক্ষে পরিস্ফুট ভাষায় কথা কহিতে কুণ্ঠিত, অথচ তার স্বরে কুৎসিত গীত গাইতে লজ্জিত নহে। কুশিক্ষার কি আশ্চর্য্য শক্তি। কুশিক্ষাপ্রভাবে সহোদরার মত স্নেহভাগিনী কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর ছায়া স্পর্শ করা অসঙ্গত, আর মাতৃসমা জ্যেষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর সঙ্গে পরিহাসপটুতা প্রদর্শন সামাজিক আমোদে অনুমোদনীয়।। ধিক্ পাপিষ্ঠ বঙ্গসমাজকে শত ধিক্।

একান্নবর্ত্তিতা অনেক স্থলে অন্যায় সঙ্কোচের অন্যতর কারণ। লোকে স্বীয় পতিকে যত ভাল বাসে, দেবরাদিকে তত ভাল বাসিতে পারে না; আপনার পুত্রকে যত ভালবাসে, পৌত্রকে তত ভাল বাসিতে পারে না। ইহা স্বাভাবিক। অতএব একান্নবর্ত্তী পরিবারে হয় পক্ষপাত না হয় অন্যায় সঙ্কোচ করিয়া চলিতে হয়। ভ্রাতুষ্পুত্র বা ভাগিনেয়কেও লোকে যথেষ্ট স্নেহ প্রদর্শন করিতে পারে, কিন্তু দেবরপুত্র বা শ্যালক-পুত্রকে অবশ্যই তত স্নেহ করিতে পারে না। অতএব একান্নবর্ত্তিতায় মানুষকে অনর্থক নিন্দার ভাজন বা কপট হইতে হয়। সম্বন্ধের নৈকট্যে ভালবাসার আধিক্য, ইহা সকলেই জানে। সুতরাং একান্নবর্ত্তীদিগের মধ্যে যাহার সঙ্গে সম্বন্ধের যত দূরতা, লোকে তাহাকে তত সন্দেহের চক্ষে দেখিতে থাকে। সে ব্যক্তি আপনিও অনুযোগের

ভয়ে স্বাভাবিকতা পরিহার করিয়া সতর্কতা অবলম্বন করে। ইহাতে একদিকে মনের সুখ ও স্ফূর্তির অভাব, ও অপর দিকে সংসারের অমঙ্গল ঘটে। মানুষ স্বভাবকে চিরকাল চাপিয়া রাখিতে পারে না, উহা কখন না কখন কোন না কোন উপলক্ষে বাহির হইয়া পড়ে। তখনই পরিবারে বিবাদ বিসম্বাদ ও অশান্তি জন্মিতে থাকে, এবং একান্নবর্ত্তী পরিবার ভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে যেন চিরদিনের জন্য পরিবার বর্গের মানোভঙ্গ হইয়া যায়। জনক-জননীর পরিচর্য্যা করা মানুষের পরম ধর্ম্ম, স্নেহের প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ সহোদর সহোদরার সুখ দুঃখেরভাগী হওয়া মানুষের অবশ্য কর্ত্তব্য, আশ্রিত ও অনুগতদিগের ভরণপোষণ ও উপকার করা মানুষেরই কার্য্য, এ সকল কার্য্যেই মানব জীবনের গৌরব। কিন্তু একান্নবর্ত্তী হইয়া করিতে গেলে, যেখানে অমৃতের স্থলে বিষ উৎপন্ন হয়, সেখানে যতদূর প্রয়োজন, দূরতা রক্ষা করিয়া এ সকল কার্য্য করাই উচিত। নচেৎ ভাল করিতে যাইয়া কুফল উৎপাদন করা, যার পর নাই অকর্ত্তব্য।

আলস্য ও অহঙ্কার পারিবারিক সুখ নাশের দুই গুরুতর হেতু। আলস্য ও অহঙ্কার দারিদ্র্যের মূলীভূত। দারিদ্র্যের মত সামাজিক দোষ আর অতি অল্পই আছে। দারিদ্র্য নানা দুঃখের জন্মদাতা, মনুষ্যের মনুষ্যত্ব নাশক এবং জনসমাজে শক্তি ও পবিত্রার মূলোৎপাটক। বাহ্য জীবনে রুচি এবং অধ্যাত্ম জীবনে শুচি, পবিত্রতার এই দুই অঙ্গ; দারিদ্র্য এই রুচি ও শুচি উভয়েরই মহাশত্রু। দারিদ্র্যের শাসনে মানুষ জগতের উন্নতি সাধন করিতে বা আপনি উন্নত হইতে পারে না; দারিদ্র্যের দংশনে পতি, পত্নীর সতীত্ব বিক্রয়ে উদ্যত হয়! এই গুণরাশিনাশী দারিদ্র্যের উৎপাদক আলস্য ও অহঙ্কার।

অহঙ্কার ও অভিমান এক কথা নহে। যে অহঙ্কারী, সে নিতান্ত

অসার ; ধর্ম্মান্তরে যাঁহার অভিমান নাই, সে মনুষ্য নহে। অভি-
মান জাতীয় চরিত্রের গুণের মধ্যে পরিগণিত। আত্মমর্য্যাদা-
জ্ঞান মনুষ্যের চরিত্রকে উন্নত রাখে। যাহার আত্মমর্য্যাদা-জ্ঞান
নাই, সে অনায়াসে সামান্য প্রলোভনে বা ঈর্ষমাত্র ভয়ে গর্হিত
কার্য্যে লিপ্ত হইতে পারে ; এবং তাহার দ্বারা সৎসাহস বা উৎকট
সাধনার কার্য্য হওয়াও একরূপ অসম্ভব। কিন্তু সেই আত্ম-মর্য্যাদা
জ্ঞান ও অহঙ্কার দুই স্বতন্ত্র পদার্থ। যাহা সৎ, যাহা স্বকীয় বিবে-
চনায় সাধু ও কর্ত্তব্য হয়, সুজনের মত তাহা অবলম্বন করিয়া,
আপনার জীবনের মূল্য বৃদ্ধি করিতে কুণ্ঠিত না হওয়ার নাম আত্ম-
মর্য্যাদা-রক্ষা। যে ব্যক্তি অযাচিত বহু বৈভব উপেক্ষা করিয়াও
অপাত্রের সঙ্গে মিত্রতা করিতে কুণ্ঠিত হয়, তাহার আত্ম-
মর্য্যাদা জ্ঞান আছে ; আর যে ব্যক্তি রাজপুত্র হইয়া রাজসিংহা-
সনে বঞ্চিত হইয়াও পরের গলগ্রহ হওয়া অপেক্ষা স্বহস্তে হল-
চালন পর্য্যন্ত শ্রেয়স্কর জ্ঞান করে, সেই আত্মমর্য্যাদা রক্ষা করিতে
পারে। কিন্তু অহঙ্কার তাহা নহে, উহার একদিকে অন্ধ বিদ্বেষ,
অপর দিকে গুরুতর অসারতা রহিয়াছে। অহঙ্কার অন্ধ, উহার
বিচার শক্তি নাই। এক দিকে আত্মতত্ত্বে অনভিজ্ঞতা, অপর
দিকে কতকগুলি লোক বা কতকগুলি কার্য্যের বিরুদ্ধে অন্ধ
বিদ্বেষই অহঙ্কারের কারণ। অহঙ্কারের বশে কত জনক
জননী গুণ ও জ্ঞানকে উপেক্ষা করিয়া মূর্খের হস্তে কন্যা
সম্প্রদান করিতে প্রস্তুত হয়। এই অন্ধ অহঙ্কার বশে বঙ্গের
ভদ্র-সন্তানেরা জঠরজ্বালায় মৃতপ্রায় হইলেও স্বহস্তে কৃষি-যন্ত্র
বা পরিমাণদণ্ড ধারণ করিতে কুণ্ঠিত হয়, অথচ তাদৃশ স্বাধীন
ব্যবসায়ীদিগের বেতনভুক ভৃত্য হইতে লজ্জিত হয় না।

আলস্য ও অহঙ্কার কেবল দরিদ্রতার উৎপাদক নহে।
পরিবারের মধ্যে এক ব্যক্তি অলস হইলে, তাহাকে অপর ব্যক্তির

গলগ্রহ হইতে হয়, অপর ব্যক্তি বা ব্যক্তিদিগকে তাহার কবণীয পরিশ্রমের ভাব বহন করিতে হয়; ইহাতেও বহুস্থলে মনো-ভঙ্গ হইয়া থাকে। পরিবার মধ্যে অহঙ্কার থাকিলেও ক্রমে সবলতা ও প্রীতির হ্রাস হয়, এবং পরিবার অশেষ দুঃখের স্থান হইয়া উঠে।

অক্ষমা পারিবারিক শান্তিভঙ্গের অন্যতব গুরুতব কারণ। সুখ দুঃখেব ভাগী হইয়া যে কতকগুলি লোক এক পরিবারভুক্ত হয়, তাহাদিগের মধ্যে বিশেষ সহিষ্ণুতার প্রয়োজন। পরিবারগণ মধ্যে পদে পদে পরস্পরের ইচ্ছা রুচি ও স্বচ্ছন্দতার পরিপন্থী হইবার সম্ভাবনা। অতএব যাহাতে মনোভঙ্গের কারণ না ঘটে, তদ্বিষয়ে যেমন সাবধান হওয়া আবশ্যক, তেমনই আবার ক্ষমাশীল হইতে যত্ন করা সর্ব্বতোভাবে কর্ত্তব্য। স্বার্থপরতা ও কোপনস্বভাব অসহিষ্ণুতার কারণ। কতকগুলি লোকের চরিত্র স্বার্থপরতায় পরিপূর্ণ; আত্মপরায়ণতাই যেন তাহা-দিগের জীবনের লক্ষ্য। সরলতা ও প্রীতির স্থলে তাহারা ঘোরতর অস্বাভাবিকতাই যেন সাধন করিয়াছে। তাহাদিগের সদ্ব্যবহার স্বার্থসাধনের সূত্রপাত স্বরূপ, তাহাদিগের সম্প্রীত সবলের হস্ত এড়াইবার জন্য, দুর্ব্বলকে করতলস্থ করিবার জন্য, আর সমকক্ষের সরলতার সুযোগে, তাহাকে আপনার স্বার্থ-সিদ্ধির পথ হইতে দূর করিবার জন্য। তাহাদিগের সংলাপ ও সম্ভাষণ ভাবশূন্য ভাষা, এবং শুষ্ক অথচ কপট লৌকিকতা মাত্র। সংসারের সঙ্গে ত তাহারা বণিকব্যবহার করেই, আপনার পরিবারকেও স্বার্থসাধনের পণ্যবীথিকা স্বরূপ মনে করে। তাহারা যেমন প্রতিবেশীর প্রতিপত্তিতে কাতর হয়, তেমনই সহোদরেরও সঙ্গে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে। তাহারা পতি বা পত্নীকে পরিচর্য্যা ও ইন্দ্রিয়াসক্তির উপকরণ মনে করে, সন্তান-

গুলিকে বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ সুখের পরিশোধের জন্য লালন পালন করে, এবং পুত্রের মত আর্জনশীল নয বলিয়া কন্যাগণকে ভারস্বরূপ মনে করে। তাহারা আত্মীয পরিজনও আশ্রিতদিগকে অভিমান ও অভিসন্ধি সাধনের সামগ্রী জ্ঞান করে। যে পরিবারে এইরূপ লোকের বসতি, শান্তি তাহার ত্রিসীমাযও তিষ্টিতে পারে না। অক্ষম অধমর্ণেরা যেমন অর্থগৃধ্নু ও নির্ম্মম উত্তমর্ণের দ্বারস্থ থাকে, তাহাদিগের সঙ্গে যাহাদিগের পারিবারিক সম্বন্ধ, তাহারাও সেইরূপ অবস্থায় থাকে। কৃতব্যাধি ঘটাইযা যেমন লোক অসুখ ও আত্মভৎর্সনায দিন যাপন করে, তদীয পরিবারও সেইরূপ অসুখে থাকিয়া অদৃষ্টকে ধিক্কার করিতে থাকে।

উগ্রস্বভাবও অসহিষ্ণুতার কারণ। অগ্নিস্ফুলিঙ্গ যেমন ফুৎকারে প্রজ্বলিত হইয়া গ্রাম নগর দগ্ধ করে, যৎসামান্য কারণেও ক্রোধোদয় হইয়া পৃথিবীতে তদপেক্ষা কত গুরুতর বিভ্রাটই ঘটিয়া থাকে। উগ্রতাবশতঃ মুহূর্ত্ত মধ্যে যে ক্ষতি হইতে পারে, চিরজীবনে তাহার প্রতীকার হয় না আবার কতকগুলি লোক এমন অসহিষ্ণু যে, পরিবার মধ্যে বিসম্বাদ ঘটাইযা অপরের নিকট গৃহছিদ্র প্রকাশ করিয়া দেয। অত্যধিক উগ্রতা তাহাদিগকে অন্ধ করিযা ফেলে; সময়ে পরের দ্বারা নিন্দিত ও ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া এই অপরিণামদর্শীতার প্রায়শ্চিত করে। এই জন্য ক্ষমাগুণকে মহর্ষি-লক্ষণ বলিযা নির্দ্দেশ করা হইযাছে। এই জন্য কথিত হইয়াছে, "যাহার ক্ষমা আছে, তিনি ত্রিলোক জয়ী হইয়াছেন।" ক্ষমাশীল লোক সমাজবন্ধনের স্তম্ভ ও শান্তির ভাণ্ডার স্বরূপ। অতএব পরিবারের মধ্যে এই ক্ষমার কত প্রযোজন! ক্ষমাশীল লোক দ্বারা যে পরিবার গঠিত হইযাছে, তাহা সংসারসুখের দুর্গ স্বরূপ, তাদৃশ পারিবারিক সুখ সম্রাটের ও আকাঙ্ক্ষনীয়। কথিত আছে, একদা চীন-সম্রাট ভ্রমণ করিতে

করিতে এক সামান্য গৃহস্থের গৃহে উপস্থিত হইয়া, তাহার বহু পরিবার ও পারিবারিক শান্তি দর্শনে বিস্মিত হইয়াছিলেন। গৃহস্বামী সম্রাটকে মৌখিক কিছু না বলিয়া সম্রাটের বিস্ময় দূর করিবার জন্য লিখিয়া দিল—"সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা, সহিষ্ণুতা।"

অশিক্ষা মনুষ্য পরিবারের সকল সৌন্দর্য্যের বিনাশ করে। পরিবার মধ্যে স্ত্রীপুরুষ সমভাবে শিক্ষিত না হইলে, পরিবার-বন্ধনের উচ্চতা ও পারিবারিক সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা হয় না। কেবল অর্থোপার্জ্জন শিক্ষার উদ্দেশ্য নহে; উহা গৌণ উদ্দেশ্য বটে, কিন্তু শিক্ষার মুখ্য উদ্দেশ্য চরিত্র-গঠন। মনুষ্যের অন্তর মার্জ্জিত করা, ও মানুষের জ্ঞানচক্ষু প্রস্ফুটিত করা শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য। অবস্থা শক্তি ও রুচি অনুসারে মনুষ্যদিগকে অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা করিতে হয়। কিন্তু অন্তঃকরণ মার্জ্জিত করার জন্য জ্ঞানচর্চা, স্ত্রীপুরুষ প্রত্যেকেরই করণীয়। অশিক্ষিতের মন কুসংস্কারের প্রেতভূমি স্বরূপ; অশিক্ষিত পরিবারও কুকর্ম্ম ও কদাচারের আশ্রয় স্থল।

পরিবার-বন্ধনে সর্ব্বোপরি ধর্ম্মভাবের প্রয়োজন। ধর্ম্মভাব ও ধর্ম্মানুষ্ঠান-বিহীন পরিবার বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ দুর্গতির উৎপত্তি স্থান। ধর্ম্মহীন পরিবার পাশব ভালবাসা ও প্রয়োজন-সাধনের সামগ্রী বই আর কিছুই নয়। উহা অতি নীচ ও নিন্দনীয়। যাঁহারা ধর্ম্মানুপ্রাণিত হইয়া পরিবার বন্ধন করেন, তাহারা রমণীয় সরোবরবক্ষে শৈবালদলবৎ ভালবাসায় আবদ্ধ, ও আনন্দনীরে নিমগ্ন। যাঁহারা ঈশ্বরের অযাচিত স্নেহের প্রতিনিধি জ্ঞানে জনকজননীকে ভক্তি করেন, যাঁহারা পতিপত্নীতে প্রাণের বিনিময় করিয়া, সম্মিলিত হৃদয়ে ঈশ্বরদত্ত সংসার সম্ভোগ করেন; মালী যেমন উদ্যান স্বামীর আদেশ জানিয়া,

অথচ স্ফূর্ত্তি ও আনন্দের সঙ্গে কুসুমতরুগুলিকে যত্ন করে, সেই-রূপে ঈশ্বরের ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া যাঁহারা সন্তান পালন করেন, তাহারা যথার্থ পরিবার সাধন করেন। পরিবার সাধন তাঁহাদিগেরই পক্ষে তৃপ্তি ও সদ্গতির হেতু হইয়া থাকে। যাঁহারা পরিবার মধ্যে শিশুর সরল হাস্য, যৌবনের রূপলাবণ্য ও প্রবীনের জ্ঞান-গরীমাকে ঈশ্বরের অযাচিত দয়ার অভিনব রূপে প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, সত্য সত্যই যাঁহারা ধর্ম্মভাবে পরিবার সাধন করেন, পরিবার তাঁহাদিগের স্বর্গসুখের প্রতি-কৃতি স্বরূপ, পরিবারের জন্য পবিশ্রম পুণ্যতীর্থের পথ-পর্য্য-টন স্বরূপ, এবং পরিবারের জন্য প্রত্যেক কার্য্য স্বর্গরাজ্যের সোপান স্বরূপ।

মহাত্মা থিওডোর পার্কার।

দৈবশক্তি-সম্পন্ন হইয়া কেহই সংসারে জন্ম গ্রহণ করে না। বিবেক বুদ্ধি ও ইচ্ছা, মানব জাতির সাধারণ সম্পত্তি। সুশিক্ষা ও সমুচিত সাধনাদ্বারা যাহারা আত্মোন্নতি সাধন করেন, তাঁহারাই পুরুষার্থ লাভ করিয়া সংসারে বরণীয় হইতে পারেন। তাদৃশ মহাজনদিগের জীবনচরিত সাহিত্য-ভাণ্ডা-রের অমূল্য রত্ন স্বরূপ। তাঁহাদিগের উৎসাহ ও অধ্যবসায়, তাঁহাদিগের পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার, এবং তাঁহাদিগের ক্ষমতা ও চরিত্রবল, অক্ষয় সম্পত্তি রূপে চিরকাল সমাজের উপকার সাধন করিতে থাকে। যাঁহারা ধর্ম্মসংস্কার বা রাজনৈতিক সংস্কার করিয়া জগতের দুঃখের ভার লঘু করিয়া যায়েন, যাঁহারা শিল্প সাহিত্য বা বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করিয়া মানবজাতির সুখের ভাণ্ডার প্রসারিত করিয়া যায়েন, তাঁহাদিগের পদচিহ্ন

অবলম্বন কবিয়া সামান্য মনুষ্য জীবন-সংগ্রামে অগ্রসব হইতে পাবে। তাঁহাদিগের চিন্তাসকল নক্ষত্রালোকেব মত সাধাবণ জনগণের গম্য পথ পবিষ্কাব কবিযা দেয; তাঁহাদিগেব বাক্য সকল সহৱাত্রীব মত দুর্ব্বল হৃদযে বল দান কবে। প্রস্তাবেব শির্ষ স্থানে আমরা যে মহাপুরুষেব নামোল্লেখ করিযাছি, এরূপ দুর্লভ মনুষ্যবত্নেব অভ্যুদয পৃথিবীব সৌভাগ্যের কাবণ। তিনি ইদানীন্তন কালেব উজ্জ্বল অলঙ্কাব স্বরূপ। তিনি ঊন-বিংশ শতাব্দিব জ্ঞান সভ্যতা ও সাধুতাব উচ্চতম পবিচয-স্থল হইযা প্রাদুর্ভূত হইযাছিলেন, এবং পৃথিবীকে জীবনেব অনুপম সৌন্দর্য্যে সুশোভিত কবিযা স্বর্গীয় দূতেব মত অমৃত-ধামে চলিযা গিযাছেন।

মহাত্মা থিওডোর পার্কাব আমেবিকাব অন্তর্বর্ত্তী বোষ্টন নগবেব পঞ্চ ক্রোশ দূববর্ত্তী লেক্‌সিংটন নামক গ্রামে ১৮১০ খৃঃ অব্দে জন্ম গ্রহণ কবেন। এই সামান্য পল্লী দুইটী ঘটনা বশতঃ জগতেব ইতিহাসে প্রসিদ্ধি লাভ কবিযাছে। সুকৃতিশালী পার্কাব বংশ সেই দুই ঘটনাব মূলীভূত। অষ্টাদশ শতাব্দিব শেষভাগে যে ভযানক সংগ্রাম-পবম্পবা দ্বাবা বৃটিশ আমেবিকার বিস্তীর্ণ উপনিবেশ ইংলণ্ডেব দাসত্ব-শৃঙ্খল হইতে বিমুক্ত হইযা যায়, যে সংগ্রামের অবসানে পৃথিবীব ইতিহাসে এক অপূর্ব্ব অধ্যাযেব আবম্ভ হইযাছে, সেই সংগ্রামেব প্রথম যুদ্ধ ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে এই লেকসিংটন গ্রামেই ঘটিয়াছিল। সেই যুদ্ধে থিওডোর পার্কাবেব পিতামহ জন পার্কার স্বদেশীয়দিগের পক্ষে অধিনায়ক ছিলেন। মহামতি থিওডোর পার্কাবেব জন্ম, লেকসিংটনের প্রসিদ্ধিব দ্বিতীয় এবং গুরুতব কাবণ। স্বদেশের রাজনৈতিক দাসত্ব মোচন জন্য, পিতামহ যে স্থানে যুদ্ধসজ্জা গ্রহণ কবিয়াছিলেন, তদীয় পৌত্র মানবজাতির ধর্ম্ম বিষযক ও

সামাজিক এবং রাজনৈতিক ত্রিবিধ সংস্কারের জন্য উত্তর কালে সে স্থানেই প্রাদুর্ভূত হইযাছিলেন। জন পার্কার লেকসিংট-নেব যুদ্ধে ব্যবহৃত অস্ত্রশস্ত্রসকল নিজ বংশ ও স্বদেশীযদিগের গৌরব-চিহ্ন স্বরূপ রাখিযা গিযাছেন। তদীয পৌত্র জগতেব ধর্ম্ম, সমাজ ও রাজনীতির সংস্কারের জন্য যে সকল অব্যর্থ অস্ত্র-শস্ত্র ব্যবহাব করিযাছিলেন, সে সকল জগতেব সাহিত্যাগাবে সুশানিত হইযা বহিযাছে। উহা অত্যাচাবীদিগকে ভয় প্রদর্শন, এবং সৎপথাশ্রিত নিপীড়িতদিগকে আশ্রয দান করিবাব জন্য চিবকাল বিদ্যমান থাকিবে।

থিওডোব পার্কাবেব পিতা ধর্ম্মভাব-সম্পন্ন স্বাধীন-চিন্তাশীল মনুষ্য ছিলেন। থিওডোবেব জননীও শিক্ষিতা ও ধর্ম্মানুপ্রাণিতা রমণী ছিলেন। তিনি বাইবল ও গাথা পাঠেই বড় অনুবাগ প্রদর্শন কবিতেন। এতদ্দ্বারা তাঁহাব ধর্ম্মতৃষা ও সহৃদযতাব বিলক্ষণ পবিচয় পাওযা যাইতেছে। পার্কাব-দম্পতি অত্যন্ত দবিদ্র ছিলেন। পবিবাবের জন্য ভৃত্য রাখিবাব সঙ্গতিও তাঁহাদিগেব ছিল না। দাবিদ্র্য অশেষ দোষেব আকব বটে, কিন্তু চবিত্রে বল থাকিলে উহাতে বড ক্ষতি কবিতে পাবে না। প্রতিকূল অবস্থাসত্ত্বেও পার্কার-দম্পতি সন্তানদিগের সুশিক্ষাব জন্য সর্ব্বদা সযত্ন থাকিতেন। মানব জীবনে বাল্যশিক্ষাব অসামান্য প্রভাব। যাঁহাবা নিজ পরিবাবেব নিকট শৈশবে সদ্ভাব ও সাধু ব্যবহার শিক্ষা করিতে পারেন, সংসাবে তাঁহা-দিগকে সত্য সত্যই সৌভাগ্যশালী বলিতে হইবে। থিওডোব তাঁহার জনক, বিশেষত জননীব নিকট আশ্চর্য্য সুশিক্ষা লাভ করিযাছিলেন।

পার্কাব বলিতেন—"ধর্ম্ম আমার মাতাব ত্যজ্য সম্পত্তি।" একথা বলিবাব তাঁহাব অধিকার ছিল। পুণ্যশীলা জননীর

নিকট থিওডোর কিরূপ শিক্ষা লাভ করিতেন, একটী সামান্য ঘটনার উল্লেখ করিলেই তাহা বিলক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হইবে। থিওডোরের যখন চারি বৎসর বয়ঃক্রম, তখন এক দিন প্রান্তরে ভ্রমণ করিতে গিয়াছিলেন। তিনি নিম্নভূমিতে এক পত্রের উপরে কচ্ছপ-শিশু বসিয়া আছে দেখিয়া, উহাকে প্রহার করিতে উদ্যত হইলেন, কিন্তু তাঁহার অন্তরে যেন কে তাঁহাকে নিবারণ করিল, আর তিনি প্রহার করিতে পারিলেন না। গৃহে আসিয়া পার্কার জননীর নিকট এই ঘটনা বর্ণন করিলেন। জননী পুত্রকে ক্রোড়ে লইয়া স্নেহভরে তাঁহার মুখ চুম্বন করিলেন, এবং গলদশ্রু লোচনে কহিলেন,—"বৎস, যে তোমাকে প্রহার করিতে নিবৃত্ত করিয়াছিল, অনেকে বলে উহার নাম বিবেকশক্তি; কিন্তু আমি বলি, আত্মার মধ্যে উহাকেই ঈশ্বরের সাক্ষাৎ আদেশ বলিয়া জানিও।"

ছয় বৎসর বয়ক্রম কালে থিওডোর পার্কার গ্রাম্য বিদ্যালয়ে লেখাপড়া আরম্ভ করিলেন। গৃহ হইতে বিদ্যালয় অর্দ্ধক্রোশ অন্তরে অবস্থিত ছিল। শৈথিল্য বা অপারগতার জন্য পার্কার কদাপি তিরস্কৃত হইতেন না। শৈশব কাল হইতেই তিনি শিক্ষকদিগের প্রতি সসম্মান ব্যবহার করিতেন। পিতা মাতা ও শিক্ষক প্রভৃতি গুরুজনের প্রতি সশ্রদ্ধ ব্যবহারে চরিত্রের যথার্থ মহত্ত্ব প্রকাশ পায়। বহু লোকের জীবনচরিত পাঠে ইহাও দেখা যায় যে, যাহারা বিদ্যালয়ে শিক্ষকদিগের সঙ্গে দুর্ব্বিনীত ব্যবহার করিয়া থাকে, তাহাদিগের জীবন প্রায়ই বিড়ম্বনার পর্য্যবসিত হয়। তাহারা প্রায় সৌভাগ্যের মুখ দেখিতে পায় না। শিক্ষা ও অবস্থাবশতঃ অনেকেই পিতা অপেক্ষা সঙ্গতিপন্ন, সহোদর অপেক্ষা সুচরিত্র এবং আপনার অধ্যাপক অপেক্ষা বিজ্ঞতর হইতে পারে। সেরূপ সময়ে নমস্য জনগণকে যে হেয়

জ্ঞান করিতে পারে, তাহার চরিত্র অতি হীন ও অস্বাভাবিক। আত্মীয় বন্ধু বা গুরুজনগণের সঙ্গে মত, রুচি বা ব্যবহারে গুরুতর পার্থক্য ঘটিতে পারে, কিন্তু তাঁহাদিগকে তুচ্ছ করা অসারের কার্য্য। নিতান্ত অর্থসম্বন্ধ বেতনভুক ও চরিত্রহীন শিক্ষক ভিন্ন, শিক্ষকমাত্রেই শিষ্যমাত্রের শ্রদ্ধা ও আদরের পাত্র। থিওডোর পার্কার যখন আমেরিকার সাহিত্য-আকাশে উজ্জ্বল নক্ষত্ররূপে প্রতিষ্ঠিত, যখন চিন্তাশীলদিগের অগ্রগণ্য ও ধর্ম্মবীরদিগের অভিবাদ্য, তখনও একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ লিখিয়া তদীয় এক জন বাল্যশিক্ষকের নামে শ্রদ্ধা ও সমাদরের সহিত উৎসর্গ করিয়াছিলেন।

ষোড়শ বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত থিওডোর বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন ও পিতার কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেন। স্বহস্তে ভূমিখনন ও হলচালন প্রভৃতি তাঁহাকে করিতে হইত। কিন্তু তিনি কি অসাধারণ মনুষ্যই ছিলেন। কার্য্যের সময় মন প্রাণ দিয়া কার্য্য করিতেন, আবার পড়িবার সময় সেইরূপেই পাঠ করিতেন। তাঁহার মেধাশক্তি বিদ্যুতের মত প্রখর ছিল, তাঁহার উৎসাহ প্রজ্জ্বলিত হুতাশনের মত, এবং তাহার পরিশ্রম ও অধ্যবসায় পর্ব্বতভেদী মহীরুহের মত সকল বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া অসম্ভবকে সম্ভব করিত। শারীরিক সামর্থ্য বা মানসিক শক্তি লাভ করিয়া জন্ম গ্রহণ করা, আর পৈত্রিক সম্পত্তি উত্তরাধিকার করা একরূপ, উহাতে পুরুষার্থ নাই। কিন্তু যাঁহারা সমুচিত পরিশ্রম ও ত্যাগস্বীকার করিয়া, চরিত্র অক্ষুণ্ণ রাখিয়া স্বাভাবিক শক্তিগুলিকে প্রসারিত ও কার্য্যকরী করিতে পারেন, তাঁহারাই প্রশংসনীয়। মহাত্মা থিওডোর পার্কার যেরূপ অসম্ভব শক্তিসামর্থ্য লাভ করিয়াছিলেন, প্রতিকূল অবস্থা স্বত্ত্বেও তাহার অনুপম সদ্ব্যবহার করিয়া গিয়াছেন। পার্কার স্বয়ং বলি-

যাছেন—"অষ্টম বর্ষ বয়ক্রমের সময় আমি আদি কবি হোমারের কাব্য ও প্লুটার্কের লিখিত জীবনী পাঠ করিয়াছিলাম। দশম বর্ষের সময় রাশি রাশি ইতিহাস ও কবিতা পাঠ করিযাছি। ঐ সময়েই লাটিন ভাষা, ও তাহার কিঞ্চিৎকাল পরে গ্রীক ভাষা শিক্ষা করিতে আরম্ভ কবি। একাদশ কি দ্বাদশ বৎসরে আমি দর্শন পাঠ করিতে আরম্ভ কবি। প্রাণীবিদ্যা, জ্যোতিষ রসায়ন ও অলঙ্কার শাস্ত্র আমি অপরের সাহায্য ভিন্ন স্বযং অধ্যয়ন করিযাছি।" তাঁহার অসাধারণ স্মৃতিশক্তির বিষয় চিন্তা কবিলে অবাক্ হইযা থাকিতে হয। একবার পাঠ কবিযাই তিনি শত শত পঁক্তি কবিতা আবৃত্তি কবিতে পারিতেন। চত্বারিংশ বর্ষ বযসে একদিন তিনি দ্বাদশ পঁক্তি পরিমিত একটী হাস্য-রসোদ্দীপক কবিতা আবৃত্তি করিতেছিলেন; জিজ্ঞাসা করায় বলিযাছিলেন যে, দ্বাদশ বর্ষ বযসে তিনি বোষ্টন নগরের চিত্রশালায এক ব্যক্তিকে ঐ কবিতাটী গাইতে শুনিযাছিলেন। সপ্তদশ কি অষ্টাদশ বর্ষ বযক্রম কালে, যখন তিনি গ্রাম্য শিক্ষকতা কবিতেন, তখন একটী রমণী তাঁহার নিকট ফরাসী ভাষা শিক্ষা করিতে আসিযাছিলেন। তিনি ঐ ভাষার কিছুই জানিতেন না। প্রাথমিক শিক্ষার পুস্তকাদি ক্রয় কবিযা আপনিও ফরাসী শিক্ষা কবিলেন, এবং এক যোগে অধ্যযার্থীনীকেও শিক্ষা দিযাছিলেন।

একদিকে এইরূপ অসাধারণ মানসিক বল, অপর দিকে জ্বলন্ত উৎসাহ ও প্রভূত পরিশ্রমই তাঁহার মহত্বলাভের কারণ। দরিদ্র ছিলেন বলিয়াই থিওডোরের পিতা তাঁহাকে গ্রন্থ ক্রয় কবিয়া দিতে পারিতেন না। প্রান্তরে যাইয়া থিওডোর জাম চয়ন কবিযা আনিতেন; উহা বোষ্টননগরে নিযা বিক্রয় কবিয়া লব্ধঅর্থে গ্রন্থ ক্রয় করিতেন। পার্কার বোষ্টননগর-বাসী দিগের

জন্য একাদশ সহস্র খণ্ড গ্রন্থ প্রদান করিয়া পরলোক গমন করিয়াছেন। উল্লিখিতরূপে জাম বিক্রয় করিয়া তাহার প্রথম খণ্ড ক্রয় করা হইয়াছিল! ইতিহাসে এরূপ ঘটনার আর উল্লেখ আছে কি না, আমরা জানি না। এরূপ ঘটনা মানবজাতির ইতিবৃত্তে স্বর্ণাক্ষরে লিপিবদ্ধ হওয়া উচিত্। এরূপ কীর্ত্তির মূলাধার যাঁহারা, তাঁহাদিগের ও প্রতিমূর্ত্তি নির্ম্মাণ করিয়া জাতীয় সাহিত্য-সমাজের অর্চ্চনার জন্য প্রতিষ্ঠিত করা উচিত। কত কত লোক পৈত্রিক বিপুল বিত্ত লাভ করিয়া, সহোদরকে পর্য্যন্ত বঞ্চিত করিয়া, কর্ম্মদোষে সর্ব্বস্বান্ত হইয়া যায়, এবং "হা অর্থ। হা বিত্ত! হা ভোগ, হা বিলাস।" বলিয়া হাহাকার করিতে করিতে পৃথিবীর ক্রমির মত উহারই মধ্যে প্রাণপরিত্যাগ করে,-কে তাহাদিগের নাম উচ্চারণ করে? কিন্তু যে সকল পুণ্যশীল মনুষ্য-রত্ন দারিদ্র্য দুঃখ ও বিড়ম্বনার মধ্যেও, অনাহারে অনিদ্রায় বা অত্যাচারের অসি-ফলকের ভয়ে উৎকণ্ঠিত থাকিয়াও, আপনাদিগের চিন্তা পরিশ্রম সঙ্গতি বা সাধুকার্য্যদ্বারা জগতের সুখ ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিয়া থাকেন, জনসমাজ চিরকাল তাঁহাদিগের মহিমা কীর্ত্তন করিয়া, তাঁহাদিগের সম্মান ও স্বকীয় সৌভাগ্য বৃদ্ধি করিয়া থাকে।

সপ্তদশ বর্ষ বয়ক্রম কালে থিওডোর পার্কার গ্রাম্য বিদ্যালয়ের শিক্ষকতা কার্য্য গ্রহণ করিলেন, এবং চারি বৎসর পর্য্যন্ত এইরূপ শিক্ষকতা করিতে লাগিলেন। শীত ঋতুতে বিদ্যালয়ে শিক্ষাদান, এবং গ্রীষ্মকালে কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেন। তাঁহার পিতামাতা অতিশয় দরিদ্র ছিলেন; শিক্ষকতাব্যপদেশে ক্ষেত্রের কার্য্যের যে ক্ষতি হইত, পরিবারের সেই ক্ষতির পূরণ জন্য তিনি একজন প্রতিনিধি রাখিতেন। পার্কার সামান্য বেতন পাইতেন, তাহাতেই আপনার ব্যয় নির্ব্বাহ

করিয়া নিযুক্ত প্রতিনিধিকে বেতন দিতেন ; আর যাহা উদ্বর্ত্ত হইত, তদ্দ্বারা পুরাতন পুস্তক ক্রয় করিতেন। এরূপ পিতৃ-মাতৃভক্ত মিতব্যয়ী বিদ্যানুরাগী ও কর্ম্মঠ সন্তানকেই যথার্থ সুসন্তান বলা যাইতে পারে। এরূপ সন্তান লাভ করা পরম সৌভাগ্য বলিতে হইবে।

এই সময়ে পার্কারের মনে ভবিষ্যৎ জীবনের বিষয়ে আন্দোলন উপস্থিত হয়। পঞ্চদশ অতীত হইলে পঞ্চবিংশতি বর্ষের অবসান পর্য্যন্ত, মানবজীবন অতি শঙ্কটস্থলে অবস্থিত থাকে। বসন্তের প্রারম্ভ হইতে নব-বর্ষার অবসান পর্য্যন্ত, যেমন বৃষ্টি বাত্যা প্রভৃতির প্রভাবে স্রোতস্বতীদেহ চঞ্চল ও পরিবর্ত্তন শীল রহে, নব-যৌবনের অবসান না হওয়া পর্য্যন্ত মানুষের অন্তরও সেইরূপ আশা উৎসাহ চিন্তা ও কল্পনায় পুনঃ পুনঃ আলোড়িত হইতে থাকে। এই শঙ্কট কালে শ্রেয়ঃ এবং প্রেয়ঃ এই দুই সপত্নী জীবন-পথের সন্ধিস্থলে দণ্ডায়মানা হইয়া ঘোরতর দ্বন্দ্ব আরম্ভ করে, মানব উহাদিগের একের উপদেশ বা অপরের প্ররোচনায় মুগ্ধ হইয়া, সুখ বা দুঃখের ভার চিরকালের জন্য মস্তকে গ্রহণ করিয়া থাকে। এ সময়ে যাহাদিগের শিক্ষা ও সহবাসের সুব্যবস্থা হয় না, এ সময়ে যাহারা স্বকীয় বলবুদ্ধি ও রুচি বুঝিয়া ভবিষ্য জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ ও অবলম্বন করিতে পারে না, এ সময়ে যাহারা বিজ্ঞ আত্মীয়ের সৎপরামর্শ লাভে বঞ্চিত থাকে, তাহারা অতি হতভাগ্য। পার্কার অসাধারণ মনুষ্য ছিলেন, তাঁহার বাল্যশিক্ষারও সুব্যবস্থাই হইয়াছিল ; সুতরাং তিনি স্বকীয় মানসিক ক্ষমতা ও হৃদয়ের গতি বুঝিতে পারিয়া, ভবিষ্য জীবনের কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করিতে পারিয়াছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার অন্তরে ধর্ম্মোপদেষ্টা হইবার

বড় অভিলাষ ছিল। সমাজ মধ্যে যখন যে শ্রেণীর লোকের বিদ্যা বুদ্ধি চরিত্র ক্ষমতা বা প্রতিষ্ঠা থাকে, যুবাপুরুষেরা তাদৃশ শ্রেণীতে নিবিষ্ট হইবার জন্য উৎসুক হয়। কিন্তু তৎকালে আমেরিকার ধর্ম্মাচার্য্যদিগের মধ্যে দুই এক ব্যক্তি ভিন্ন কেহই বড় উপযুক্ত লোক ছিলেন না, তাঁহাদিগের উপরে পার্কারের শ্রদ্ধা অত্যন্ত কম ছিল। এইজন্য তিনি একবার ব্যবহার-শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে অভিলাষ করেন। কিন্তু সর্ব্বদেশে এবং সর্ব্বকালে, সমাজের অতি গুরু দায়ীত্ব স্কন্ধে লইয়া, সুকৃতি ও সুখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়া জীবন যাত্রা নির্ব্বাহের উপায় থাকা সত্ত্বেও, অধিকংশ ব্যবহারবিদ বড়ই চরিত্রহীন হইয়া পড়েন। ব্যবহারবিদ হইলে হয় তো হৃদয়ের গতিরোধ করিতে, অথবা বিবেকের বিরুদ্ধাচরণ করিতে প্রবৃত্তি হইতে পারে, এই আশঙ্কায় তিনি উক্ত অভিলাষ পরিহার করিলেন।

এইরূপ চিন্তাকুলতার সময়ে পার্কারের মনে একদিন তিনটী প্রশ্নের উদয় হইল। কেহ যেন তাঁহার অন্তর মধ্যে তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিল,—"যাহা অবিনশ্বর সত্য, সম্প্রদায় বা ধর্ম্মসমাজের মতামত দ্বারা বিভ্রান্ত না হইয়া, তুমি কি তাহা অনুসন্ধান করিতে পার, এবং লোকসমাজে নিন্দিত ও ঘৃণিত হইতে হইলেও কি তুমি সেই প্রাপ্ত সত্য প্রচার করিতে পার?" পার্কার উত্তর করিলেন। "হাঁ পারি।" দ্বিতীয় বার প্রশ্ন হইল,—"যাহা প্রকৃত ও অক্ষয় ন্যায়, ধর্ম্মাচার্য্য রাজনীতিজ্ঞ অথবা সামাজিকদিগের কৃত বিধি বা রীতিদ্বারা বিচলিত না হইয়া, তাহাই কি তুমি অনুসন্ধান করিতে পার; কোন ব্যক্তির বা সমাজের স্বার্থের পক্ষে বা বিরুদ্ধে সেই ন্যায় ঘোষণা করিতে গেলে, যদি দুঃখযন্ত্রণা পাইতে হয়, তাহা ঘোষণা করিতে পার কি?" পার্কার

উত্তর করিলেন—"হাঁ ইহাও পারি।" আবার প্রশ্ন হইল,—"তুমি বাক্যে যাহা প্রচার কর, বিপরীত ব্যবহার দ্বারা তাহাকে কলঙ্কিত না করিয়া, তোমার জ্ঞানলব্ধ সত্য ও বিবেকের অনুমোদিত ন্যায় স্বকীয় জীবনে প্রদর্শন করিতে পার কি?" পার্কার বলিয়াছেন,—"এই প্রশ্নে আমি ভীত হইলাম, আমি ইতস্ততঃ করিলাম, এবং ক্ষণপরে স্থির স্বরে বলিলাম,—"হাঁ আমি চেষ্টা করিতে পারি, এবং আমি তাহাই করিব।" মনোমধ্যে এবম্বিধ আন্দোলনের পরে, আমি ধর্ম্মাচার্য্য হইতেই সংকল্প করিলাম। যে কার্য্য করিলে মানবজাতির উন্নততর শক্তি বিকাশের সহায়তা করাযায়, তাহাই অবলম্বন করিতে আমি প্রবৃত্ত হইলাম।"

বিংশতি বর্ষ বয়ক্রম পর্য্যন্ত থিওডোর পার্কার শীত ঋতুতে শিক্ষকতা এবং গ্রীষ্মাবকাশে পিতার কৃষিক্ষেত্রে কার্য্য করিতেন। এই সময়ে এক দিন তিনি বাটী হইতে পদব্রজে কেম্ব্রিজে গিয়া আবশ্যকীয় পরীক্ষাদান করিয়া হারবার্ড কলেজে অবৈতনিক ছাত্ররূপে ভর্ত্তি হইয়া আসিলেন। প্রায় অর্দ্ধ-রাত্রিতে বাড়ী আসিয়া পিতাকে বলিলেন,—"পিতঃ আমি হারবার্ড কলেজে ভর্ত্তি হইয়াছি।" পিতা বলিলেন,—"থিওডোর এ কি করিলে, তুমি কি জান না, তোমাকে তথায় রাখিয়া পড়াইবার সঙ্গতি আমার নাই।" পার্কার কহিলেন,—"তজ্জন্য ভাবনা নাই, আমি বাড়ী হইতে যাইয়াই পাঠ করিব। এইরূপে তিনি এক বৎসর অধ্যয়ন করিয়া যোগ্যতার সহিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেন।

একবিংশ বর্ষ বয়সে ১৮৩১ খৃষ্টাব্দে পার্কার পিতৃভবন পরিত্যাগ করিয়া, বোষ্টন নগরে কোন প্রাইভেট স্কুলে শিক্ষক হইলেন। এসময়ে তিনি অসাধারণ পরিশ্রম করিয়াছিলেন।

দিনের মধ্যে তিনি ছয় সাত ঘণ্টা অধ্যাপনা এবং দশ এগার ঘণ্টা অধ্যয়ন করিতেন। এত গুরুতর পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে, তিন মাস মধ্যে তাঁহার দেহভার চতুর্দ্দশ সের ন্যূন হইয়া গিয়াছিল। অবস্থার প্রতিকূলতা এরূপ গুরুতর শ্রমের কারণ। এজন্য উত্তরকালে তাঁহাকে দারুণ ক্ষোভ করিতে হইয়াছিল।

–এক বর্ষকাল পার্কার বোষ্টন নগরে থাকিয়া তত্রত্য শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিলেন। কলেজে অধ্যয়নের জন্য অভিলষিত অর্থ সঞ্চয় করিতে না পারাই বোষ্টন পরিত্যাগের কারণ। বোষ্টন পরিত্যাগ করিয়া ওয়াটার-টাউন নামক স্থানে স্বয়ং এক বিদ্যালয় খুলিলেন। এই বিদ্যালয়ের আরম্ভে দুইটী মাত্র ছাত্র ছিল, দুইবর্ষ পরে তিনি যখন উহা ছাড়িয়া আইসেন, তখন ছাত্রসংখ্যা চতুর্পঞ্চাশৎ হইয়াছিল। পার্কার এমন ধর্ম্মভাব-সম্পন্ন ছিলেন যে, প্রতিদিন ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া বিদ্যালয়ের কার্য্য আরম্ভ করিতেন। বিদ্যালয়ের ছাত্রেরা তাঁহার অধ্যাপনায় ও সেই অপরিণত বয়সেই তাঁহার অভিভাবক সদৃশ ব্যবহারে, তাঁহার প্রতি এত অনুরক্ত হইয়াছিল যে, আসিবার সময় তাঁহাকে একটী রৌপ্য বাটী উপহার প্রদান করে। বিদায় কালে তাহারা অশ্রু বিসর্জ্জন করিয়াছিল, তিনিও উচ্চৈঃস্বরে রোদন করিয়াছিলেন।

হারবার্ড কলেজে চারি বৎসর অধ্যয়নের পর তাঁহাকে এই মর্ম্মে বি এ উপাধি প্রদান করা হয় যে, তিনি ঐ চারি বৎসরের কলেজের বেতনের টাকা দান করিবেন। বেতনের টাকা তিনি কোথা হইতে দিবেন? সুতরাং তাঁহার উপাধি পাওয়া না পাওয়া সমান হইল। কিন্তু যোগ্যতা সর্ব্বদা অবস্থার অন্তরালে লুক্কায়িত থাকে না। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দে কতকগুলি বড় লোক বিবেচনা করিলেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের এমন যোগ্যতম ছাত্র

অর্থাভাবে অসম্মানিত থাকা নিতান্তই অসঙ্গত। সুতরাং তাঁহাদিগের পরামর্শ ও অনুরোধে ঐ সময়ে থিওডোর পার্কারকে এম এ উপাধি প্রদান করা হইল। কিন্তু এইরূপ সম্মানে বঞ্চিত থাকায় মহামনা পার্কার ক্ষুণ্ণ ছিলেন না। যথার্থ যোগ্যতার সমাদর এ সংসারে বড় হয় না। পরমুখ-প্রেক্ষী ও পরবাক্য-বাদী সাধারণ জনগণই উপাধি বা আড়ম্বর দ্বারা উপযুক্ততার বিচার করিয়া থাকে। প্রকৃত বিজ্ঞ ও বিচক্ষণেরা আড়ম্বর-বিহীন সারবান জীবন মধ্যেও লুক্কায়িত গুণগৌরব প্রত্যক্ষ করিতে পারেন। সংসারের নিন্দা বা প্রশংসা বহু স্থলেই অর্থসঙ্গতি বা পদমর্যাদার মুখাপেক্ষা করে। কিন্তু যিনি আপনার চরিত্রগত উন্নতি ও জগতের উপকার সাধন এবং বিধাতার নিয়ম পালন করিয়া আত্মপ্রসাদ রূপ ভূমানন্দ লাভ করেন, তিনিই জীবনে যথার্থ পুরস্কার লাভ করেন। পার্কার এমনই নিরভিমান ছিলেন যে, কেহ তাঁহাকে "ভক্তিভাজন" বা "শ্রদ্ধাস্পদ" বলিয়া পত্রাদিতে সম্বোধন করিলেও তিনি আপত্তি করিতেন। বিনয় তাঁহার বিদ্যাবত্তার উজ্জ্বলতর অলঙ্কার স্বরূপ ছিল।

বিএ উপাধি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া পার্কার অধ্যাত্মদর্শন অনুশীলনের জন্য ওয়াটার-টাউন পরিত্যাগ করিয়া কেম্ব্রিজে গমন করিলেন। বিদ্যালয় খুলিয়া তিনি অল্প মাত্র সংস্থান করিয়াছিলেন, তথায় যাইয়া কয়েকটী বালক বালিকাকে শিক্ষা দান করিয়া কিছু পাইতেন। দরিদ্র ছাত্রদিগকে সাহায্য করিবার জন্য তথায় একটী ফণ্ড হইতেও আর কিছু সাহায্য পাইতেন। এইরূপে তিনি অধ্যয়ন আরম্ভ করিলেন। তাঁহাকে অতি গুরুতর মানসিক পরিশ্রম করিতে হইত; যাহাতে সঙ্গে সঙ্গে শরীর-সঞ্চালনও হইতে পারে, এই জন্য পার্কার কলেজ হইতে কিছু দূরে এক বাটী ভাড়া করিয়া রহিলেন। তদীয়

কোন চরিতাখ্যায়ক এ সময়ে তাঁহার বেশভূষা ও ব্যবহারের এইরূপ বর্ণনা করিয়াছেন। "এ সময়ে তাঁহার মুখচ্ছবি অতি স্বাভাবিক ভাবে পূর্ণ ছিল। তাঁহার পরিচ্ছদ পরিষ্কার থাকিত, কিন্তু তাহাতে পরিধান-পারিপাট্য থাকিত না। উন্নত হইবার জন্য তাঁহার উচ্চাভিলাষের বিরাম ছিল, না। তাঁহার সাধুতা মিথ্যাভাষা স্বপ্নেও কল্পনা করিতে পারিত না। তাঁহার হাস্য সরল ও বসন্তকালের ন্যায় মাধুর্য্যে পরিপূর্ণ ছিল। যখন শ্রেণীতে অধ্যাত্মদর্শন সম্বন্ধীয় বাদানুবাদ চলিত, তখন অনেক সময়েই তিনি স্থিরভাবে বসিয়া স্বকীয় রুমালের মধ্যে গ্রন্থি দিতেন। তিনি বলিতেন, যে সকল প্রতিকূল যুক্তি তাঁহাকে খণ্ডন করিতে হইবে, উহার এক এক গ্রন্থিতে তাহার এক একটী বুঝাইত। উত্তরকালে তিনি ধর্ম্মসমাজ ও শাসন-সমাজের কুসংস্কার ও কুব্যবহারের উপরে যে ভয়ানক কশাঘাত করিয়াছিলেন, এইরূপ গ্রন্থি-সংযোগেই সেই প্রহারবজ্জু প্রস্তুত হইয়াছিল সন্দেহ নাই।"

পার্কারের মনঃসংযমের পরিচয় একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই হইবে। যে গৃহে বসিয়া তিনি পাঠ করিতেন, তাহার সম্মুখস্থ সংলগ্ন গৃহে আর কয়েক জন সমপাঠী অনেক সময়েই গীতবাদ্য করিয়া তাঁহাকে বিরক্ত করিত। কিন্তু এজন্য পার্কার একদিনও তাহাদিগের উপর রাগ করেন নাই। এক দিন অতি নিবিষ্ট চিত্তে তিনি পাঠ করিতে ছিলেন, উক্ত সহাধ্যায়ীগণ গোলমাল করিয়া তাঁহার পাঠের বড়ই ব্যাঘাত উপস্থিত করিল। তখন তিনি পাঠে ক্ষান্ত হইয়া এক খণ্ড কাষ্ঠ লইয়া, তাহাদিগের গৃহের সম্মুখে বসিয়া ঘর্ঘর শব্দে কর্ত্তনী দ্বারা ছেদন করিতে লাগিলেন; সেই উচ্চ কর্কশ শব্দে সহধ্যায়ীদিগের গীত ও আমোদ ভাঙ্গিয়া গেল, তাহারা দ্বার উদ্ঘাটন করিলে তিনি তাহাদিগের মুখের

দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাস্য করিলেন। তাহারা ঐই পরিহাসের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়া অত্যন্ত লজ্জিত হইল। এইরূপ অসাধারণ সহিষ্ণুতা ও মনঃসংযম ছিল বলিয়াই, পার্কার পঠদ্দশায় এককালে চতুর্দ্দশ মাস সময় মধ্যে বিবিধ ভাষায় তিন শত বিংশতি খণ্ড গ্রন্থ পাঠ করিয়াছিলেন। ইহারই গুণে উত্তর কালে তিনি দ্বাবিংশতি ভাষায় অধিকার লাভ করিয়াছিলেন, এবং ইহারই বলে তিনি স্বপ্রণীত বহুসংখ্যক অমূল্য গ্রন্থ দ্বারা জনসমাজের বিদ্যা ও জ্ঞানের ভাণ্ডার সুশোভিত করিয়া গিয়াছেন। প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়াও, শক্তি থাকিলে এবং যত্ন ও পরিশ্রম করিলে যে পৃথিবীতে মহত্ত্ব লাভ করা যায়, মহাত্মা থিওডোর পার্কারের জীবন তাহার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্বরূপ।

অধ্যাত্মদর্শনে পাঠ সমাপন করিয়া, পার্কার বোষ্টন নগরের সন্নিহিত ওয়েষ্ট-রক্স্বেরী নামক স্থানের একত্ববাদী খৃষ্টীয় সম্প্রদায়ের ধর্ম্মাচার্য্যের পদে বরিত হইলেন; এবং এই স্থানে কয়েক বৎসর যাপন করিলেন। এ সময়ে আমেরিকায় বিবিধ বিষয়ে গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। ইহারই অব্যবহিত পূর্ব্বক্ষণে আমেরিকার একত্ববাদী খৃষ্টান সম্প্রদায়, রাজদ্বারে তাহাদিগের সর্ব্ববিধ অধিকার বলবৎ করিয়া লইয়াছিল, এই সময়েই লণ্ডে, গ্যারিসন প্রভৃতি মহাত্মারা আমেরিকার নিদারুণ দাস ব্যবসায়ের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করিয়াছিলেন; এই সময়ে চ্যানিং ও ইমার্সন প্রভৃতি মহাপুরুষেরা স্বকীয় লেখনী ও বাগ্মীতা প্রভাবে আমেরিকাবাসীদিগকে স্বপ্নমুগ্ধবৎ পরিচালিত করিতেছিলেন, ওয়ার্ডস্ওয়ার্থ, কার্লাইল ও কুজিন প্রভৃতি প্রাতঃস্মরণীয় মহাত্মাগণের যে সকল গ্রন্থ পাঠে, মানুষের হৃদয়ে গুরুতর ভাব ও মানুষের মনে অভিনব চিন্তার উদ্রেক হয়, সংঘর্ষণ সংগ্রাম ও সংস্কার যে সকল অমূল্য গ্রন্থ পাঠের

অবশ্যম্ভাবী ফল, আমেরিকায় এ সময়ে সেই সকল গ্রন্থ বহুলরূপে পঠিত হইতেছিল। এই ঘোরতর বাত্যার সময়ে আমেরিকার উজ্জ্বলতম নক্ষত্র এক কোণে হাস্য করিতে করিতে দেখা দিয়াছিলেন। তাহার ভবিষ্য জ্যোতিঃ তখনও কেহ সম্যক অনুভব করিতে পারে নাই। অসার ও অলস ব্যক্তিরাই শয্যাকীটের মত উদরপূর্ত্তি ও তন্দ্রা-সম্ভোগ করিয়া জীবন যাপন করিয়া যাইতে চাহে। সাবধান লোকেরা কার্য্যের সুযোগ দেখিলে আনন্দিত হয়েন, জীবনের সদ্ব্যবহার করিতে পারিবেন বলিয়া দুর্ব্বলতা ও প্রতিকূলতা বিস্মৃত হইয়া যায়েন। পার্কার বলিয়াছিলেন,—"ঈশ্বরকে ধন্যবাদ, স্বদেশের এই প্রয়োজনের সময়ে আমি যুবাপুরুষ।"

তিনি পরিশ্রমে কাতরমাত্র হইতেন না। অসাধারণ মনঃশ্চালনার সঙ্গে সঙ্গে গুরুতর শারীরিক পরিশ্রমে কদাপি বিমুখ ছিলেন না। প্রতিদিন আট দশ ক্রোশপথ পদব্রজে গমন করিতে তাঁহার বিশেষ ক্লান্তি হইত না। একদা তিনি নিউইয়র্ক নগর হইতে বোষ্টন নগরে পদব্রজে গমন করিয়াছিলেন; সে যাত্রায় প্রত্যহ পঞ্চদশ ক্রোশ করিয়া চলিয়াছিলেন। তিনি উৎসাহে আগ্নেয়গিরির মত ছিলেন, আপনার হৃদয়ের আবেগে নিয়ত অস্থির থাকিতেন। অবস্থার প্রতিকূলতা কিম্বা কার্য্যক্ষেত্রের অনুপযোগীতা হেতু, যখন তিনি মনোমত কার্য্য করিতে না পারিতেন, তখন তাঁহার ক্ষোভের সীমা থাকিত না। যাহারা অনায়াসে পূর্ব্বপুরুষদিগের ত্যক্ত সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হয়, যাহারা স্বগণের যত্নে ও বহুব্যয়ে রীতিমত শিক্ষা পাইয়া বুদ্ধিমানের সহজপ্রাপ্য উপাধি লাভ করিয়া গৌরবান্বিত হয়, এবং তৎপরেও কেবল আত্মচিন্তায় ও ভদ্রতা-রক্ষার জন্য ব্যস্ত থাকে, তাহারা এই নিদারুণ ক্ষোভের কি বুঝিবে?

যাঁহারা আপনাদিগের স্বাভাবিক শক্তিসামর্থ্য অবগত আছেন, এবং আত্মচিন্তা-পরায়ণ না হইয়া জীবনের দায়ীত্ব স্মরণ করেন, দারিদ্র্য রোগ বা অপর কোন দুর্বিপাক যদি তাঁহাদিগের অভিপ্সিত-সাধনের প্রতিপন্থী হয়, তখন তাঁহাদিগের যাদৃশ মনোদুঃখ হয়, আহার বিহার বা ভদ্রতা-রক্ষার অভাব বা অসুবিধা জনিত ইতর ভাবনা তাহার সঙ্গে তুলনীয়ই নহে। মহাত্মা থিওডোর পার্কারকে সময়ে সময়ে এইরূপ ক্ষোভাগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইয়াছে। মৃত্যুশয্যায় শয়ন করিয়াও তিনি এইরূপ আক্ষেপ করিয়াছিলেন,—"ঈশ্বর আমাকে প্রভূত আন্তরিক শক্তি প্রদান করিয়াছিলেন, কিন্তু হায়, আমি তাহার অর্দ্ধমাত্র প্রয়োগ করিতে পারিয়াছি।"

কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিবার অল্পকাল পরেই থিওডোর পার্কারকে মহাসংগ্রামে প্রবৃত্ত হইতে হইয়াছিল। এরূপ সংগ্রাম মহাপুরুষদিগের জীবনের অপরিহার্য্য লক্ষণ স্বরূপ। শতবর্ষ পরে যে সকল চিন্তা মানুষের মনে উদিত হইবে, যে সকল সত্য জনসমাজে প্রচারিত হইয়া সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইবে, মহামনস্বীগণ অন্তশ্চক্ষুতে তাহা দেখিতে পাইয়া, তাহাই প্রচার করিতে থাকেন। সাধারণ জনগণ তচ্ছ্রবণে চকিত হয়, এবং আপনাদিগের সামান্য বিচার-শক্তি দ্বারা তাহা সহসা হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারিয়া, তাঁহাদিগকে উন্মাদ বা মিথ্যাবাদী মনে করে। সমাজের যে সকল পুরাতন দূষণীয় প্রথা বা চরিত্রহীন লোক সামাজিক দুঃখ দারিদ্র্যের নিদান, মহাপুরুষদিগের নিকট তাহারা গুরুতর চক্ষুশূল হইয়া পড়ে। তাঁহাদিগের প্রশস্ত হৃদয় সর্ব্বদাই লোকহিতের জন্য ব্যাকুল, তাঁহারা তাদৃশ লোক ও তাদৃশ প্রথার বিরুদ্ধাচরণ না করিয়া ক্ষান্ত থাকিতে পারেন না। তাহাতেই কেহ বা আপনার ব্যবসায়ের ক্ষতি ও অর্থো-

পার্জ্জনের, ব্যাঘাত হয় বলিয়া তাদৃশ মহাজনগণের শত্রু হইয়া পড়ে ; কেহবা আপনার জ্ঞানগরীমা পদমর্য্যাদা ও সাধুতার খ্যাতি খর্ব্ব হয় বলিয়া, উদযোন্মুখ মহত্বের প্রতি দারুণ ঈর্ষা-যুক্ত হইয়া থাকে। অপর সাধারণ অজ্ঞ লোকেরা গড্ডলিকা-প্রবাহবৎ পুরাতন প্রথা ও প্রথিতযশা জনগণেরই অনুসরণ করে। সুতরাং মহাপুরুষদিগকে কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই যেন সমগ্র সমাজের সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হয় ; নিগ্রহ নিপীড়ন ও নির্য্যাতনের সঙ্গে সংগ্রামে জয়ী হইয়া, সমাজের মধ্যে আপনাদিগের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। সৌভাগ্য-ক্রমে কেহ কেহ জীবনের শেষ দশায় সমাজ মধ্যে আপন কঠোর তপস্যার ফল প্রত্যক্ষ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু অধিকাংশই দারুণ পরিশ্রমে মরুভূমিবক্ষে অনশ্বর বীজ বপন করেন বটে, আপনারা কেবল শান্তি ও আশার সহযোগেই অমৃত লোকে গমন করেন।

সংসারের কতকগুলি বিষয় অতি আশ্চর্য্য। লোক-চরিত্রে যাঁহাদিগের অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে, তাঁহারা দেখিয়াছেন যে, জন-সমাজে যে সকল মনুষ্য বারম্বার শপথ করে, তাহারাই বারম্বার মিথ্যা কথা কহিয়া থাকে। যখন কোন সমাজে লোকের ধর্ম্ম-জ্ঞান ও চরিত্রবলের হ্রাস হইয়া পড়ে, তখনই সেই সমাজের মনুষ্যগণ কথায় কথায় শাস্ত্রের দোহাই দিয়া থাকে ; কিন্তু কার্য্যকালে আপনারা শাস্ত্র-বাক্য অল্পই পালন করিতে পারে। মহামতি থিওডোর পার্কার কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই দেখিতে পাইলেন, তৎকালীন আমেরিক খৃষ্টানদিগের অবস্থা অতি শোচনীয়। ধর্ম্মাচার্য্যদিগের অধিকাংশই ভণ্ড ও দুরাচার। অনেকেই মুখে ঈশ্বরের পিতৃত্ব ও মানবের ভ্রাতৃভাবের কথা উচ্চারণ করিত, কিন্তু কার্য্যকালে দাসব্যবসায়ী, শৌণ্ডিক ও

অপরাপর দুষ্কার্য্যশালীদিগের সপক্ষতা করিত। সত্যবাদী থিওডোর পার্কার এই সকল লোককে অসার ও প্রতারক বলিয়া সর্ব্বদা গুরুতর অনুযোগ করিতেন। আবার পুরাতন শাস্ত্রের যে সকল আখ্যান বা উপদেশ তিনি জ্ঞান নীতি ও বিশ্বাসের বিরোধী মনে করিতেন, সুপুরুষের মত সিংহগর্জ্জনে তাহা ঘোষণা করিতেন। তাঁহার তীব্র রসনা ও অপরাজিত লেখনী প্রভাবে সমস্ত আমেরিকাখণ্ড উদ্বেজিত হইয়া উঠিয়াছিল। তাঁহার লেখনীর বিরুদ্ধে লেখনী চালনা করিতে, বা তাঁহার বাক্যের বিরুদ্ধে বাক্য উচ্চারণ করিতে সাহস না পাইয়া, স্থানে স্থানে উপাসনা-মন্দিরেও এইরূপ প্রার্থনা হইয়াছে— "হে ভগবান, পাষণ্ড থিওডোর পার্কারের জ্বালায় আর আমরা বাঁচি না। উহার যুক্তি আমারা খণ্ডন করিতে পারি না। তুমি দয়া করিয়া উহার লেখনী বন্ধ কর, অদ্যাবধি উহার রসনা আড়ষ্ট হইয়া যাউক।" থিওডোরের অসাধারণ ক্ষমতার ও তৎকালীন খৃষ্টানদিগের দুরবস্থার সুন্দর দৃষ্টান্ত আর কি হইতে পারে?

এইরূপ স্বাধীন ধর্ম্মভাব ও অকপট সাধুব্যবহারের পুরস্কার থিওডোর পার্কার ভালই লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার ঘনিষ্ঠ বন্ধুরাও তাঁহাকে পরিত্যাগ করিল। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হইলে তাঁহার সঙ্গে কেহ কথা কহিত না, কেহ তাঁহার করস্পর্শ করিত না, সভাস্থলে তাঁহার সঙ্গে কেহ এক আসনে উপবেশন করিত না, কেহ বা তাঁহাকে নাস্তিক ও পাষণ্ড বলিয়া সম্বোধন করিত, কেহবা তাঁহাকে ভোলটেয়ার ও পেইন প্রভৃতি নাস্তিকদিগের অন্যতর মনে করিত। কেহবা তাঁহাকে রাজদণ্ডে দণ্ডিত করিয়া কারারুদ্ধ করিবার জন্যও অনুরোধ করিল। সমস্ত সংবাদপত্র তাঁহার বিরুদ্ধে উত্থান করিল। কোন গ্রন্থ-

ব্যবসায়ীই তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদি প্রচারের ভার গ্রহণ করিতে স্বীকার করিত না। কিন্তু এ সকল নির্য্যাতনে পরাস্ত হইবার লোক তিনি ছিলেন না। তিনি উচ্চৈস্বরে তাঁহার বিরোধী-দিগকে বলিয়াছিলেন, "যদি কেহ আমাকে পরাস্ত করিতে পারে, সে ব্যক্তি আমি।" বাস্তব ইহাই সত্য। আমরা স্বীয় চরিত্রের হীনতা দ্বারা আপনাদের যত ক্ষতি করিয়া থাকি, অপরে তাহার কিছুই করিতে পারে না। যে ব্যক্তি আপনাকে আপনি রক্ষা করে, বিপদ-পরম্পরাও সহজে তাহার কিছু করিতে পারে না।

যখন নির্য্যাতনের একশেষ আরম্ভ হইল, যখন বিরোধী-দিগের ষড়যন্ত্রে, তাঁহার ধর্ম্মাচার্য্যদিগের শ্রেণীর বহির্ভূত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছিল, তখন তিনি অত্যন্ত ক্ষোভ অথচ দৃঢ়তার সহিত বলিয়াছিলেন,—"না হয় আমি বৎসরের সাত আট মাস অধ্যয়ন করিব, আর অবশিষ্ট চারি পাঁচ মাস বক্তৃতা করিয়া বেড়াইব। পথপ্রান্তে বা প্রান্তরে—যেখানে নরনারীর দেখা পাইব, সেখানেই প্রচার করিব। উত্তর দক্ষিণ পূর্ব্ব পশ্চিম পর্য্যটন করিয়া সমগ্র দেশ কম্পিত করিব। আমেরিকার যে ভাক্ত ধর্ম্মশাস্ত্র মানুষের হৃদয় মনকে অন্ধ ও নির্জ্জীব করিয়া রাখিয়াছে, উহা ভূমিসাৎ করিবই করিব। যদি না হয়, তবে জানিব, উহাতে এমন অনেক সত্য লুক্কায়িত আছে, যাহা আমি বুঝিতে পারি নাই। আচার্য্য-শ্রেণীর বহির্ভূত হইতে, বিশেষতঃ আমার ক্ষুদ্র উপাসক সম্প্রদায়টী পরিত্যাগ করিবার কথা মনে করিতেই আমার অন্তরাত্মা ব্যথিত হয়। কিন্তু যদি কর্ত্তব্যানুবোধে পরিত্যাগ করিতে হয়, আমার কি সাধ্য যে, কর্ত্তব্যের সে আদেশ পালন না করি।" সত্য সত্যই সাধু-ব্যক্তিরা পুত্র বিত্ত এবং জীবন অপেক্ষাও কর্ত্তব্য-পালনকে

প্রিয়তব্ মনে করেন, পদচ্যুতি বা বন্ধুবিচ্ছেদকে তাঁহাবা যৎসামান্যই মনে কবিয়া থাকেন।

এই সংগ্রাম সময়ে ও তৎপূর্ব্বে ও পবে, তিনি যে সকল বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করেন, অবশেষে তাহাই গ্রন্থাকাবে প্রচাব কবিয়াছিলেন। ঐ সকল গ্রন্থেব ন্যায় ধর্ম্মবিষয়ক উৎকৃষ্ট গ্রন্থ বোধ হয় জনসমাজে অতি অল্পই প্রচাবিত হইয়াছে। উহাতে তাঁহাব বিশ্বজনীন উদার ভাব, বিস্তীর্ণ চিন্তাশীলতা, প্রখবতব বিচাবশক্তি, অটল ধর্ম্মবিশ্বাস ও অপবিসীম চবিত্রবল প্রকাশ পাইয়াছে। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ কবিলে এক দিকে গ্রন্থকাবেব প্রতি যেমন গভীব শ্রদ্ধা ও সম্মানভাব উদ্রেক হয়, তেমনই আবাব উহা পাঠ কবিয়া সহস্র সহস্র আত্মা অবিশ্বাসেব শুষ্কতা, কুশিক্ষা ও কুসংকাবেব অন্ধকাব, এবং ধর্ম্মব্যবসায়ীদিগেব স্বার্থপব প্রবোচনা হইতে বক্ষা পাইয়া, স্বর্গপথের যাত্রী হইতে পারে।

অতঃপব আমরা সংক্ষেপে থিওডোর পার্কাবেব ইউরোপ-ভ্রমণবৃত্তান্ত বর্ণন কবিব। পার্কাব বলিয়াছেন,—"স্বদেশের প্রতি যদি স্নেহের বৃদ্ধি করিতে হয়, তাহা হইলে কিয়ৎকাল বিদেশে যাইয়া থাক, এতদপেক্ষা শ্রেষ্ঠ উপায় আব নাই।" বস্তুতঃ দেশপর্য্যটনেব কেবল এই একমাত্র উপকারিতাও নহে। বিভিন্ন জাতীয় লোকের আচার ব্যবহাব পর্য্যবেক্ষণ, এবং ইতিহাসে যে সকল আশ্চর্য্য কাণ্ড ও অদ্ভুত বিষয় পাঠ কবা গিয়াছে, স্বচক্ষে তাহাব কিঞ্চিৎও প্রত্যক্ষ না কবিলে, শিক্ষাবই সমাপ্তি হয় না। যাহারা শৈশবে পিতামহী-প্রমুখাৎ অলীক উপন্যাস শ্রবণ করে, যৌবনে কেবল পুস্তক পাঠ করিয়া "শিক্ষিত" হয়, এবং শেষ কালেও কেবল নগবেব চতুঃসীমার মধ্যে বা কার্য্যালয়ে গতায়াত করিয়া জীবন যাপন কবে, তাহাদিগেব শিক্ষা অনেক স্থলেই

অন্ধের হস্তি-দর্শনবৎ বিড়ম্বনায় পর্য্যবসিত হয। প্রকৃত সভ্য-সমাজেও তাহাদিগকে উপহাসের পাত্র হইযা থাকিতে হয।

• ইউনাইটেড্ বাজ্য ও আমেবিকা-সমাজ অভিনব। ইউবোপেব পুবাতন সমাজ, পুরাতন কীর্ত্তি ও পুরাতন শিল্পসাহিত্য প্রত্যক্ষ করিবার অভিলাষ, বহু দিন পার্কারের অন্তরে জাগরূক ছিল; অর্থ ও অবকাশের অভাবে তাহা পূর্ণ হয নাই, এত দিনে সে অভিলাষ চবিতার্থ হইতে চলিল। ১৮৪৩ খৃঃ অব্দে তিনি ইংলণ্ডাভিমুখে যাত্রা কবিলেন। ইংলণ্ডে অল্প কয দিন মাত্র থাকিযা ফ্রান্স দেশে গমন কবিলেন। ইত্যবসরে লণ্ডন নগবে "একেশ্ববাদীদিগেব অলঙ্কাব স্বরূপ অধ্যাপক নিউম্যান, এবং ভাব ও চিন্তাব অকৃত্রিম প্রতিমূর্ত্তি স্বরূপ মহাত্মা কাবলাইল প্রভৃতি মহাপুরুষদিগেব সঙ্গে সাক্ষাৎ কবিলেন, অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালযেব জগদ্বিখ্যাত বোডলিযান পুস্তকালয এবং কবি-কুলকলাধব মৃত্যুঞ্জয সেক্ষপীবেব জন্মস্থান প্রভৃতি দর্শন কবিযা তিনি পবম পবিতুষ্ট হইযাছিলেন।

ফ্রান্সদেশে যাইয়া তিনি পাবিস, লাযন্স ও আভিগনন প্রভৃতি পবিদর্শন কবিলেন। থিওডোব বলিযাছেন,—"ফরাশীবা আমোদ প্রিয, আব ইংবেজেব পবিশ্রমী। বোধ হয বর্ত্তমান সময়ে ইংলণ্ডেব অভ্যুদয, ও ফ্রান্সেব বিগত বিড়ম্বনাব ইহাই মূল কাবণ। ইটালী দেশে যাইযা থিওডোব ফ্লোবেন্স জেনোযা ও নেপলস্ প্রভৃতি নগব সন্দর্শন কবেন। শেষোক্ত নগবে চিবস্মণীয বাফেলেব চিত্রসকল দর্শন কবিযা তিনি বিস্মযাপন্ন হইয়াছিলেন। কিন্তু কেবল নাগবিক সভ্যতা ও স্থাপত্য প্রভৃতি দেখিযাই তাঁহাব তৃপ্তি হইত না। ইটালীদেশে অবস্থানকালে তিনি বিসুবিযস নামক আগ্নেযগিবিব অগ্ন্যুৎপাৎ দেখিতে গিযাছিলেন, তিনি অগ্নিমুখেব এক নিকটবর্ত্তী হইযাছিলেন যে, উৎক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র প্রস্তবখণ্ড

সকল তাঁহার স্কন্ধোপরি আসিয়া পতিত হইয়াছিল। যে স্থানে বাগ্মীকুল-চূড়ামণি সিসিরো বাস করিতেন, যে স্থানে কবিকুল-চূড়ামণি বর্জ্জিল সমাহিত হইয়াছিলেন, তিনি তৎসমুদয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। কিন্তু কেবল পুরাতন কীর্ত্তি অথবা স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যও তাঁহার আলোচনার বিষয় ছিল না। তিনি সর্ব্বত্রই সামাজিকদিগের আচার ব্যবহার এবং চরিত্রগত উন্নতি ও অবনতি লক্ষ্য করিতেন। তিনি বলিয়াছিলেন, "ইটালি দেশ শিল্পনৈপুণ্যের পরাকাষ্ঠা ও সামাজিক দুর্গতির আলয় স্বরূপ।" প্রাচীন সভ্য-জগতের রাজধানী রোম নগর তিনি বিশেষরূপে পরিদর্শন করিয়াছিলেন। রোম নগরে জগদ্বিখ্যাত কলিসিয়ম্ নামক চিত্রশালা পরিদর্শন কালে তাঁহার অন্তঃকরণ ভাবসাগরে আপ্লুত হইয়াছিল। রোম রাজ্যের ভূত ও বর্ত্তমান উন্নতি ও অবনতি চিন্তা করিয়া তিনি বলিয়াছিলেন,—"হায়, এই রোম নগর দুইবার জগতের রাজধানী হইয়াছিল। পূর্ব্ব বারে শারীরিক বল, এবং পর বারে আধ্যাত্মিক অত্যাচারই উহার সেই আধিপত্যের কারণ, কিন্তু দুই বারই উহার অধোগতি হইয়াছে।" আদ্রিয় সাগর-সৈকতে সংস্থাপিত ভেনিস নগরের সৌন্দর্য্য দর্শনে মুগ্ধ হইয়া তিনি কহিয়াছিলেন, "বরুণদেব যেন সমুদ্র-প্রকোষ্ঠে শয়ন করিয়া স্বপ্ন দেখিতেছিলেন; তাঁহার সেই স্বপ্ন ঘনীভূত হইয়া ভেনিস নগরের সৃষ্টি হইয়াছে।" পার্কার ভেনিস নগরের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়াছিলেন বটে, আমরা তাঁহার সৌন্দর্য্যানুরাগ ও কল্পনার সৌন্দর্য্য দেখিয়া মোহিত হইতেছি।

ইটালী পরিত্যাগ করিয়া তিনি অষ্ট্রিয়া দেশে গমন করিলেন, তথায় ভিয়েনা ও ড্রেস্‌ডেন প্রভৃতি নগর দর্শন করিলেন। প্রুশিয়ার রাজধানী বর্লিন নগর দর্শন করিয়া তিনি কিছুই সুখানুভব করেন নাই। কিন্তু জার্ম্মাণদিগের রাজনৈতিক ও

সামাজিক অবস্থা দেখিয়া তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। ষোড়শ শতাব্দিতে ইউরোপে যে ভয়ানক অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছিল, তাহার মূলাধার মহাপুরুষ লুথার, এবং তদীয় উপযুক্ত বন্ধু ও সহকারী মিলাংথন যেখানে সমাহিত হয়েন, উইটেম্বর্গ নগরে যাইয়া তিনি সে স্থান দর্শন করেন। মহাত্মা লুথার ধর্ম্ম সংস্কার আরম্ভ করিলে, এবং ক্যাথলিক ধর্ম্মের বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রচার করিলে, ঐ ধর্ম্মের গুরু রোমের পোপ তাঁহাকে অভিশাপ পত্রদ্বারা জাতিচ্যুত করেন। নির্ভীক লুথার যেস্থানে সেই পত্র অবজ্ঞার সহিত দগ্ধ করেন, তিনি সে স্থান পরিদর্শন করিয়াছিলেন ; এবং তৎকালে আপনাকে দ্বিতীয় লুথাররূপে অনুভব করিয়াছিলেন। জার্ম্মেণী পরিত্যাগ করিয়া তিনি সুইজার্লণ্ড দেশে গমন করেন। তথায় জেনিভা নগরে রাজনীতিজ্ঞ ও সমাজনীতিজ্ঞদিগের অগ্রগণ্য ভোলটেয়ারের আবাস-স্থল দর্শন করিয়া কহিয়াছিলেন, "অহো, এই সামান্য প্রকোষ্ঠে থাকিয়া, তিনি পৃথিবীর সম্রাট ও ধর্ম্মগুরুদিগকে বিকম্পিত করিতেন!" বাস্তব ভোলটেয়ারের অগ্নিময় লেখনীর কি অপরিসীম ক্ষমতা ছিল। নিদারুণ ফরাশী-বিপ্লবের সময়ে সহস্র সহস্র শাণিত অসি উত্তোলিত হইয়া যাহা সমাধা করিয়াছে, ভোলটেয়ারের লেখনীর এক আঘাতে, তাহা কত পূর্ব্বেই অদৃষ্টফল-রূপে সমপন্ন হইয়া রহিয়াছিল! সম্বৎসর কাল ইউরোপে পরিভ্রমণ করিয়া পার্কার পুনর্ব্বার ইংলণ্ড হইয়া স্বদেশে প্রত্যাবৃত্ত হইলেন। প্রত্যাবর্ত্তন সময়ে লিভরপুল নগরে মহামতি ডাক্তার মার্টিনো প্রভৃতি মহাজনগণের সহিত তাঁহার ঘনিষ্ঠ সৌহার্দ্দ সংস্থাপিত হয়।

ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে, তাঁহার পূর্ব্ব-আত্মীয়গণ থিওডোর পার্কারকে আদরের সহিত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

এই অনতিদীর্ঘ অনুপস্থিতিকাল মধ্যেই তাঁহার বন্ধু সংখ্যা বর্দ্ধিত হইয়াছিল। মানুষের প্রকৃতিই এইরূপ, প্রতিদ্বন্দী অনুপস্থিত হইলে, তাহার সঙ্গেঅধিকতর মহানুভূতি জন্মিয়া থাকে। অনুপস্থিতির অবসরে তাঁহার প্রতি বিদ্বেষ কমিয়া যায়, আর উত্তেজনার হ্রাস হওয়া বশতঃই তাহার কথা বা কার্য্যের ভাল মন্দ বিচার করিতে সক্ষম হওয়া যায়। সময়েও সাধুতার পরীক্ষা হইয়া থাকে। দীর্ঘকাল সাধু ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলে, গুরুতর মতদ্বেষ্টারও প্রতিবাদীর প্রতি শ্রদ্ধা জন্মে। আর যাহারা মূর্খতা অভ্যাস-দোষ বা স্বার্থপরতা বশতঃ অনর্থক গ্লানি বা মিথ্যা জনরব প্রচার করে, তাহারাও আপনা আপনি পরাস্ত হয়, এবং লোকের নিকট মুখ না পাইয়া নিরস্ত হইয়া যায়। এই কারণেই ইউরোপ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলে থিওডোরের আত্মীয় সংখ্যা বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাহাতেই তিনি পূর্ব্বাপেক্ষা অধিক উৎসাহ ও সুযোগ সহকারে কার্য্য করিতে লাগিলেন।

কিন্তু তাঁহার সমস্ত জীবন ঘোরতর সংগ্রামেই অতিবাহিত হইয়াছিল। পৃথিবীতে এক শ্রেণীর লোক আছে, যাহারা সৎ অথচ মৃদুপ্রকৃতি, এবং যাহাদিগের জীবনের কার্য্য ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ। তাহাদিগের বিশ্বাসের সঙ্গে শাস্ত্র বা সমাজের সংঘর্ষণ হয় না, তাহারা বিধি-নির্দ্দিষ্ট সাধুকার্য্যে দিনঃপাত করিয়া সাধারণের প্রিয়পাত্র হইতে পারে। অপর এক শ্রেণীর লোক চরিত্রহীন, কিন্তু চতুর। যে স্থানে যেরূপে চলিলে কার্য্যোদ্ধার হয়, তাহারা সেইরূপেই চলে, যাহার সঙ্গে যেরূপ কথাটী বলিলে প্রশংসা ভিন্ন অপ্রশংসা হয় না, তাহারা তাহাই বলে। কাহাকেও যদি মায়াজালে বদ্ধ করিতে হয়, তাহাকে শুনাইয়া অথচ পরোক্ষবাদীর মত তাহার তোষামোদ করে, কাহাকেও নিন্দা করিয়া যদি স্বার্থসাধন করিতে হয়, তাহার জন্য কৃত্রিম

খেদ প্রকাশ করিয়া সে নিন্দাকে সত্য কথায়, এবং আপনার বিষময় কুটিল হৃদয়কে সদন্তঃকরণে পরিণত করিতে চেষ্টা করে। তাহারা ধার্ম্মিকের নিকটে ভগবদ্ভক্ত, নাস্তিকের নিকটে নাস্তিক, রাজার নিকটে দাসানুদাস ও সামাজিকের নিকটে সাধারণ মতের স্বপক্ষ হইতে পারে। ন্যায়নিষ্ঠা সত্যানুরাগ বা চরিত্রগত উন্নতি এ সকল লোকের লক্ষ্য নহে; সকলকে সন্তুষ্ট করিয়া স্বার্থসাধন করা ও প্রতিপত্তি লাভ করাই ইহাদিগের কাম্য। ইহারা বহুরূপীর মত নানা বেশ ধারণ করিয়া সাধারণ জনগণের সম্মানার্হ হইতে পারে বটে, ঈদৃশ লোক পদস্থ হইলে; উপকার-প্রাপ্তি মানসে কতকগুলি লোক নীচতা অবলম্বন করিয়া ইহাদিগের গুণকীর্ত্তন বা অনুবর্ত্তন করে সন্দেহ নাই, কিন্তু বিচারক্ষম বিচক্ষণ লোকেরা উহাদিগকে নিতান্ত অসার ও অপদার্থ মনে করিয়া ঘৃণা করেন।

আরও এক শ্রেণীর ক্ষমতাশালী লোক ভূমণ্ডলে অবতীর্ণ হয়েন, সত্য ন্যায় এবং লোক-হিতব্রত পালন করাই তাঁহাদিগের জীবনের উদ্দেশ্য। তাঁহাদিগের বুদ্ধি ভবিষ্যতের অন্ধকার ভেদ করিতে পারে; তাঁহাদিগের সৎসাহস স্বার্থ বা সমাজের মুখাপেক্ষা করে না; আর তাঁহাদিগের প্রশস্ত হৃদয় লোকহিতের জন্য সর্ব্বদা ব্যাকুল থাকে। এ সকল লোক কপটতার বিষম শত্রু, ও নিপীড়িতদিগের চিরসহায়। এ সকল লোক সর্ব্বদা সত্যের জয় ঘোষণা ও সাধুতার মহিমা কীর্ত্তন করেন। সুতরাং ইঁহাদিগের সমস্ত জীবন-কাল যেন সমাজের সঙ্গে সংগ্রাম করিতে করিতেই অতিবাহিত হয়। মহাত্মা থিওডোর পার্কার এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। কার্য্যক্ষেত্রে প্রবেশ করিয়াই তিনি অধ্যুষিত সমাজের পঙ্কোদ্ধার করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন, নূতন নূতন অবস্থা ও নূতন নূতন ঘটনা ঘটিয়া, তাঁহার সেই

পরিশ্রমের আর পরিসমাপ্তি হইল না। ইউরোপ হইতে স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অব্যবহিত পরেই তিনি যে মহা-সংগ্রাম আরম্ভ করিলেন, নিম্নে সংক্ষেপে তদ্বিবরণ প্রদান করাযাইতেছে।

মানবজাতির ইতিহাস অতি অদ্ভুত। ভিন্ন ভিন্ন কালে ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ও ভিন্ন ভিন্ন সমাজে উহার এরূপ আশ্চর্য্য রূপান্তর যে, প্রকৃত ঘটনাই কল্পনার বৈচিত্র্যকে পরাস্ত করিতে পারে। আজি আমরা যে সকল কথা চিন্তা করিতে শিহরিত হই, কস্মিন কালে কোনও দেশে তাহা অনিবার সংঘটিত হইত; আজি আমরা কল্পনাবলে স্বর্গের যে চিত্র অঙ্কিত করিয়া ধরাতলে তাহা অসম্ভব মনে করি, কস্মিন কালে কোনও দেশে তদপেক্ষা উজ্জ্বলতর বেশভূষায় সমাজ সুশোভিত হইবে সন্দেহ নাই। দাস-ব্যবসায়ের ইতিহাস কি ভয়ঙ্কর। মানুষ একদিকে স্বর্গের দেবতা, অপর দিকে নরকের কীট হইতে পারে। প্রীতি ও পবিত্রতা মানুষের দেবভাবের উৎপাদক; স্বার্থ এবং কুরুচিই তাহার পশুভাবের কারণ। জগতে মানুষ চিরকাল এই দেবত্ব ও পশুত্ব প্রদর্শন করিয়া আসিয়াছে। যখন ধর্ম্ম ও নীতির একান্ত ছড়াছড়ি, তখনও মানবজাতির সবল ও সক্ষমেরা, দুর্ব্বল ও অসহায়দিগের উপরে শ্বাপদবৎ অত্যাচার করিয়াছে, অনেক স্থলে সভ্যতার দোহাই দিয়া অসভ্যতার পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করিয়াছে। নিদারুণ দাসত্ব প্রথা তাদৃশ অসভ্যতার অন্যতর। দাস-ব্যবসায় ইদানীন্তন সভ্য-সমাজের দুরপনেয় কলঙ্ক স্বরূপ ছিল। সৌভাগ্যক্রমে প্রায় সমস্ত সভ্য-সমাজ হইতে অল্পদিন হইল সেই কলঙ্ক তিরোহিত হইয়াছে। যাহারা দাসত্ব-প্রথার বিস্তারিত ইতিবৃত্ত অবগত নহে, সংক্ষেপে তাহাদিগের অবগতির জন্য সেই ঘোরতর নির্ম্মম প্রথার উৎপত্তি ও প্রকৃতির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

আফ্রিকার পশ্চিম ও দক্ষিণ উপকূলে নিগ্রো ও কাফ্রি প্রভৃতি কতকগুলি অসভ্য লোকের বাস। অসভ্য জাতির সাধারণ রীতি অনুসারে উহারা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের অধিনায়ক রাজা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণ, মৃগয়া লুণ্ঠন ও সংগ্রাম করিয়া দিনঃপাত করিয়া থাকে। দস্যুবৃত্তি বা পরস্পর-বিবাদ করিয়া এ সকল লোক যাহাদিগকে বন্দী করিতে পারে, তাহারা চিরকাল ইহাদিগের নিজস্ব হয়। পঞ্চদশ শতাব্দির শেষ ভাগে ইউরোপীয়েরা আমেরিকা ও ভারতবর্ষের নৌ-পথ আবিষ্কার করে। ষোড়শ শতাব্দির আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গে উহারা আমেরিকার আদিম নিবাসীদিগকে নির্ম্মূল করিয়া, নূতন মহাদ্বীপে উপনিবেশ সংস্থাপন, ও আফ্রিকার কূলবর্ত্তী জনপদ সমূহের সঙ্গে অধিকতররূপে পরিচিত হইতে থাকে। আফ্রিকা ও আসিয়ার সঙ্গে বাণিজ্য ও সংগ্রাম, আর আমেরিকায় কৃষিকার্য্য ও লুণ্ঠন, এবং স্বদেশে শিল্প বিজ্ঞান ও সাহিত্যের অনুশীলনই ইদানীন্তন ইউরোপীয়দিগের অভ্যুদয়ের কারণ। আমেরিকা হস্তগত হইলে, তথাকার বিস্তীর্ণ ও উর্ব্বর ক্ষেত্র সমূহে ইউরোপীয়েরা কৃষিকার্য্য আরম্ভ করিল। যে ব্যক্তি প্রয়োজনের অনুরোধে স্বহস্তে হলচালন করে, অথবা স্বদেশের ধনবৃদ্ধির জন্য দেশান্তরে উপনিবেশ সংস্থাপন করে, তাহার নিন্দা নাই, বরং তাহার প্রশংসা করা উচিত। কিন্তু ইউরোপীয়েরা তাহা করিত না; তাহারা আদিম নিবাসীদিগের সম্পত্তি বলপূর্ব্বক অধিকার করিত, আর তন্মধ্যে দাসদিগের দ্বারা কৃষিকার্য্য করাইয়া বিস্তর লাভবান হইত। আফ্রিকার উপকূল ভাগ হইতে তাহারা বহুসংখ্যক দাস ক্রয় করিয়া লইয়া যাইত। নিষ্ঠুর ও পশু-স্বভাব অসভ্য অধিনায়কেরা সামান্য অর্থের লোভে, এবং ইউরোপীয় কাঁচসূচিকাদি যৎসা-

মান্য পদার্থের চাকচিক্যে বিমুগ্ধ হইয়া, অসংখ্য লোককে বন্দী ও দাস করিয়া ইউরোপীয় বণিকদিগের ও কৃষক প্রভু দিগের নিকট বিক্রয় করিত। অসভ্যদিগের নিকট দাস-দিগকে ক্রয় করিয়া "সভ্য" ইউরোপীয়েরা তাহাদিগকে নিজ সম্পত্তিরূপে ব্যবহার করিত, গো মেষাদিবৎ গণ্য করিত। সামান্য আহার ও পরিচ্ছদ দিয়া গুরুতর পরিশ্রম করাইয়া লইত। মানব জাতিতে জন্মগ্রহণ করিয়া তাহাদিগের জীবনের স্বাধীনতা কিছুই থাকিত না। মানুষের বিচার শক্তির অপার মহিমা! পাঁচজন দাস একত্র হইয়া কথোপকথন করিলে, তৎকালীন রাজনিয়মানুসারে, প্রভু আসিয়া দাসদিগকে গর্দ্দভযূথবৎ কশাঘাত করিতে পারিত। গুরুতর শ্রমভার ও শাসন-যন্ত্রণা বহন করিতে না পারিয়া কোন দাস পলায়ন করিলে, রাজনিয়মের সাহায্যে তাহাকে পুনরায় ধরিয়া আনিয়া, প্রভু যেরূপ ইচ্ছা দণ্ড বিধান করিতে পারিত। প্রহারে প্রহারে কাহারও প্রাণাত্যয় হইলেও, কয়েক মুদ্রা অর্থদণ্ড প্রদান করিলেই প্রভু রাজদ্বারে অব্যাহতি পাইতেন। কেবল ইহাই নহে। অর্থাভাব উপস্থিত হইলে বিজ্ঞাপন দিয়া "হৃষ্ট পুষ্ট ও বলিষ্ঠ" দাসদিগকে কুক্কুর ও ঘোটকের ন্যায় বিক্রয় করিত। জননীর বক্ষস্থল হইতে কাড়িয়া লইয়া, অপগণ্ড শিশুগুলিকে অপরিচিত বিদেশীয় ক্রেতার নিকটে সমর্পণ করিত। শুভ্রকায়দিগের স্বার্থ, কৃষ্ণকায়দিগের স্বাধীনতা বা স্নেহমমতার মুখাপেক্ষা করিবে কেন? ইউরোপীয়েরা শিক্ষিত, ক্ষমতাশালী ধার্ম্মিক ও সভ্য। অসভ্যদিগের উপর অত্যাচার না করিলে, তাহাদিগের উন্নততর প্রয়োজন সকল সাধিত হইবে কেন? বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় যে, এই গর্ব্বিত ঊনবিংশ শতাব্দিতেও ইউরোপ ও আমেরিকার সুসভ্য সমাজে, মানবের দেবদত্ত

জীবন ও অধিকাব লইয়া এরূপ নৃশংস ও পৈশাচী অভিনয় হইত। ইউবোপীযেরা স্বকীয় ও স্বদেশের স্বাধীনতার জন্য প্রাণ দান করিতে পাবেন, কিন্তু পবের ও পরদেশেব স্বাধীনতা লইয়া যথেচ্ছা ক্রীড়া কবিতে ভাল বাসেন। স্বার্থেব কি অপার মাহাত্ম্য, উহাতে মানুষের ধর্ম্মবুদ্ধিকেও কলুষিত কবে।

•যে সময়ে মহাত্মা থিওডোব পার্কাব প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন, তখন আমেবিকায এই ঘৃণিত• দাস-ব্যবসায় প্রচলিত ছিল; কিন্তু সর্ব্বত্র উহাব সমান প্রাদুর্ভাব ছিল না। ঈশ্বরের রাজ্যে অত্যাচাব ও অবিচার চিরকাল প্রতিষ্ঠিত থাকিতে পারে না। উহাবই অব্যবহিত পূর্ব্বে, ইউনাইটেড রাজ্যেব উত্তর প্রদেশ সমূহে ঐ কুপ্রথা রহিত হইয়াছিল। আব কতকগুলি মহাপুরুষেব হৃদয়ে উহা জনসমাজ হইতে একেবারে উন্মূলিত কবিবার ইচ্ছা বলবতী হইযাছিল। কিন্তু জগতে ইহা চিরকাল দেখা গিযাছে যে, কোন সাধুকার্য্য আরম্ভ কবিলে প্রথমতঃ তাহার স্বপক্ষ অপেক্ষা বিপক্ষেব সংখ্যা অনেক অধিক আসিয়া উপস্থিত হয। স্বার্থ এবং দুঃস্বভাববশতঃ অনেক লোক সে সময়ে দাসত্ব-প্রথার সমর্থন করিত। কেহ বলিত—গো মেষাদি পালন, আব দাস রক্ষা করিবাব অধিকাব সমান; কোন প্রভুব দাসকে স্বাধীনতা দান করিতে যাওয়া, আর সেই প্রভুর একটী বলিবর্দ্দ অপহরণ করা একই কথা। অনেক ধর্ম্মাচার্য্য দাসত্বের স্বপক্ষে উপদেশ প্রদান করিতেন; কেহবা বলিতেন, উহা খৃষ্টীয় ধর্ম্মশাস্ত্রের বিধিব বিরুদ্ধ নহে। দাস ব্যবসাযে কতকগুলি লোকের সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন স্বার্থ ছিল না, কিন্তু নিগ্রো জাতিব বিরুদ্ধে ভযানক কুসংকাব ছিল। সেই কাবণে, এবং পাছে এই আন্দোলন বিবাদে পবিণত হইযা নবগঠিত ইউনাইটেড বাজ্য ভঙ্গ হইয়া যায, এই আশঙ্কায তাঁহারা দাসত্বেব বিরোধীদিগকে অল্পবুদ্ধি ও হটকারী

মনে করিত। কেহ কেহ বা দাসবিরোধীদিগের এই আন্দোলনকে আপনাদিগের স্বার্থসাধন ও মহত্ব লাভের উপায় বলিয়া নিন্দা ও গ্লানি করিত। দুর্ব্বল ও অসহায় দাসদিগের হিতসাধন করিতে যাইয়া, অপরাপর কতিপয় মহাজনের সঙ্গে থিওডোর পার্কারকেও, এই সকল প্রতিবাদীর সঙ্গে বিবাদে প্রবৃত্ত হইতে হইল।

পার্কার বলিতেন "এই দাসত্ব-প্রথা সমস্ত জঘন্যতার সমষ্টি স্বরূপ।" ওয়েষ্ট-রক্সবেরিতে অবস্থান কালেই তিনি ভজনালয়ের বেদীতে বসিয়াও এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে অনেক বক্তৃতা ও উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহার সেই চেষ্টায় অনেক সুফল ও ফলিয়াছিল। লোকের মন এত পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল যে, সে সময়ের কোন একটী উপদেশ তাঁহাকে দ্বিতীয়বার দান করিতে হইয়াছিল, তৎপরে উহা মুদ্রিতও প্রচারিত হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি যখন বোষ্টন নগরে আসিয়া আচার্য্য হইলেন, তদবধিই তিনি একেবারে ঐ চিন্তায় বিব্রত হইয়া পড়িলেন। তিনি ঐ কুপ্রথার উন্মূলনে আপনার সময় অর্থ ও দেহমন উৎসর্গ করিলেন। এজন্য তিনি ইউনাইটেড রাজ্যের সমস্ত উত্তর প্রদেশে পর্য্যটন করিয়াছিলেন, যেখানে দাসত্বের বিরুদ্ধে সভাসমিতি হইত, সেখানেই যাইয়া বক্তৃতা করিতেন। এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে তিনি নিরুৎসাহীদিগকে উত্তেজিত করিতেন, সাহসীদিগের প্রশংসা করিতেন, অনভিজ্ঞদিগকে শিক্ষা দান করিতেন, অবিশ্বাসীদিগকে গ্লানি ও ভর্ৎসনা করিতেন, এবং বজ্রনাদী বক্তৃতা করিতে করিতে প্রদেশ হইতে প্রদেশান্তরে পরিভ্রমণ করিতেন।

প্রকৃতির একটী সদয় নিয়ম এই যে, অত্যাচার যত প্রকাশ্য ও উহার দৃশ্য যত শোচনীয় হয়, তাহা নিবারণের জন্য সমা-

জের হৃদয় তত ব্যথিত ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। ১৮৪৪ খৃঃঅব্দে চারল্‌স্ টোবী নামক একজন শ্রদ্ধেয় ধর্ম্মযাজক ম্যারিলাণ্ড প্রদেশের কারাগারে ক্ষয়-রোগে প্রাণত্যাগ করেন। দাসদিগকে উদ্ধার করাই তাঁহর কারাবদ্ধ হইয়া অপরাধ ছিল। এই ঘটনাতে দাসহিতৈষীদিগের অন্তরে বড় ব্যথা জন্মে। তৎপর বৎসর আর একটী ঘটনা ঘটে। নিউ-অর্লিনস্ প্রদেশের কোন প্রভুর একজন দাস পলায়ন করিয়াছিল,বোষ্টননগর বাসী জনৈক নির্দ্দয় বণিক ব্যবসায়ের জন্য ঐ প্রদেশে যাইতেছিল, সে উক্ত পলাতক দাসকে তাহার প্রভুর নিকট প্রত্যর্পণ করিবার জন্য ধরিয়া লইয়া চলিয়াছিল। বণিকের পোত বোষ্টন নগরের উপকূলে উপনীত হইলে নগরবাসীরা যাইয়া দেখিল, নিষ্ঠুর বণিক হতভাগ্য দাসকে পোতের অভ্যন্তরে একরূপ দৃঢ়বদ্ধ করিয়া এত অল্প স্থানে লুক্কায়িত রাখিয়াছে যে,ভয়েও শ্বাসরোধ হইয়া হতভাগ্যের শেষ দশা উপস্থিতপ্রায় হইয়াছে। এই সকল ঘটনা অবগত হইয়া সহৃদয় দাস-হিতৈষীদিগের দুঃখ ও ক্রোধের সীমা রহিল না।। দাসদিগের রক্ষণ ও সহায়তার জন্য তাঁহারা অবিলম্বে এক সমাজ গঠন করিলেন, চিরস্মরণীয় দাসহিতৈষী জন কুইন্সী অ্যাডামস্ প্রভৃতি লোক সেই সভার কর্ম্মকর্ত্তা, এবং মহামতি পার্কার ঐ সভার কার্য্য-নির্ব্বাহকদিগের শির্ষস্থানীয় ছিলেন।

১৮৪৭ খৃষ্টাব্দে ইউনাইটেডরাজ্যর অধিবাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া, পার্কার দাসত্ব-প্রথা বিষয়ে এক পুস্তিকা প্রচার করেন। এই পুস্তিকা প্রচারের পর দাস-ব্যবসায়ীরা পার্কারকে "সয়তানের হৃদয়" অভিধান প্রদান করিয়াছিল। দক্ষিণ প্রদেশের সংবাদ পত্র সকল তাঁহাকে উন্মত্ত বলিয়া ঘোরতর আক্রমণ করিয়াছিল। এ সময়ে অনেক লোকে পার্কারকে আসিয়া বলিয়াছিল,—

"আপনিং বেদীতে বসিয়া যাহা করেন, জাতীয় শাসন-সভায় প্রবেশ করিলে, দাসত্ব নিবারণ ও এবম্বিধ অনেক সৎকার্য্য তদপেক্ষা অধিক করিতে পারেন সন্দেহ নাই। পার্কার বলিয়াছিলেন, "মহাসভায় প্রবেশ করিবার দুইটি প্রতিবন্ধক এই যে, হয়তো কেহই আমাকে সভ্য মনোনীত করিবে না। দ্বিতীয় আপত্তি এই যে, রাজকার্য্যে নিযুক্ত হওয়া আমার জীবনের লক্ষ্য ও নিয়তি নহে। স্বাধীন ভাবে দূরে থাকিয়া কার্য্য করিতেই আমি ভালবাসি।" পার্কারের শুভবুদ্ধি যাহা নির্দ্দেশ করিয়াছিল, তাহা জগতের হিতের জন্যই হইয়াছিল; মহাসভায় প্রবেশ করিলেও বোধহয় তৎকালে অধিক কার্য্য হইত না। অপর পার্কার আপনার সাধনা ও চিন্তার যে সকল অমূল্য ফল জনসমাজের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন, রাজকার্য্যের অধীনতা ও ব্যস্ততার মধ্যে তাহা তত রাখিতে কখনই পারিতেন না। রাজকার্য্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করিলে, না হয় তিনি শেষকালে আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হইতেন, কিন্তু তিনি বৈষয়িক ক্ষমতা ও প্রতিপত্তি-বিহীন হইয়াও যাহা করিয়া গিয়াছেন, তাহাতেই তাঁহার সিংহাসন চিরকাল মানবহৃদয়ে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে।

ইউনাইটেড রাজ্যের উত্তর প্রদেশ সমূহে দাসত্ব-প্রথা রহিত হওয়ায়, বহুসংখ্যক দাস দক্ষিণ প্রদেশসমূহ হইতে পলায়ন করিয়া উত্তর প্রদেশসমূহে আশ্রয় লইত। দাস-ব্যবসায়ীদিগের চেষ্টাও ষড়যন্ত্রে, এবং অপর কতকগুলি বিশিষ্ট লোকের পোষকতায়, ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে এইরূপ এক রাজবিধি প্রচারিত হইল যে, উত্তর প্রদেশে যে ব্যক্তি পলাতক দাসকে আশ্রয় দান করিবে, তাহার সহস্র মুদ্রা অর্থদণ্ড ও ছয়মাস কারাবাস দণ্ড হইবে। পার্কার স্বয়ং এই বিধি লঙ্ঘন করিয়াছেন, এবং আচার্য্যের আসনে বসিয়াও, সকলকেই এই ন্যায় ও ধর্ম্মবিরুদ্ধ ব্যবস্থা

লঙ্ঘন করিতে অকুতোভয়ে উপদেশ দিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থা প্রচারে তিনি যার পর নাই উদ্বিগ্ন ও ব্যথিত হইয়াছিলেন। পার্কারের স্বপ্রদেশবাসী সুপ্রসিদ্ধ ডেনিয়েল ওয়েবষ্টার ঐ বিধির পোষকতা করিয়াছিলেন। ওয়েবষ্টারের বিদ্যা বুদ্ধি সঙ্গতি ও সমাজে অসাধারণ প্রতিপত্তিছিল। পার্কার তাঁহাকে পূর্ব্বাপর বড় শ্রদ্ধা করিতেন, এবং তাঁহার গুণ গ্রামের বড় পক্ষপাতীছিলেন, এমন কি স্বকীয় পাঠাগারে তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়া ছিলেন। এই ঘটনার পর তাঁহার প্রতি পার্কারের শ্রদ্ধা একেবারে কমিয়া গেল। পার্কার কহিয়াছিলেন,—"এইক্ষণ ওয়েবষ্টার স্বর্গরাজ্যের পথ অপেক্ষা ইউনাটেড-রাজ্যের প্রেসিডেণ্ট হইবার পথ অধিক অনুসন্ধান করেন।" পার্কার আপন পাঠাগার হইতে ওয়েবষ্টারের প্রতিমূর্ত্তি নামাইলেন, অতি বিষাদের সহিত উহাকে শেষ আলিঙ্গন প্রদান করিলেন, এবং দৃষ্টির বহির্ভূত করিয়া রাখিয়া দিলেন। সংসারে মতদ্বৈধ হইলে যাহাদিগের প্রণয় ভঙ্গ হয়, তাহারা অতি সঙ্কীর্ণমনা। উদরতাই সক্ষমতা ও চরিত্রবলের পরিচয় প্রদান করে। কিন্তু স্বার্থ অথবা সুনাম সাধনের জন্য আপনার মত বা উক্তির বিপরীতাচরণ করিতেছে, এরূপ সন্দেহ যাহার উপরে হয়, নিতান্ত ঘনিষ্ট আত্মীয় অথবা উপযুক্ত বন্ধু হইলেও তাহার মুখাপেক্ষা করা সুজনের কর্ত্তব্য নহে। কর্ত্তব্য ও লোক-হিতের তুলনায় শত শত ওয়েবষ্টারের প্রণয়ও থিওডোরের মত ধর্ম্মবীরের নিকট তুচ্ছ এবং উপেক্ষণীয় ছিল সন্দেহ নাই।

উল্লিখিত নৃশংস বিধি প্রচারিত হইলে, পলায়িত দাসদিগের মহাত্রাসের সৃষ্টি হইল। দিবসত্রয় মধ্যে এক বোষ্টননগর হইতেই চল্লিশ জন দাস নানাদিকে পলায়ন করিল। যাহারা বহুকাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করিবার পরে, পলায়ন করিয়া

দূরদেশে আসিয়া মানব জীবনের স্বর্গীয় সত্ত্ব ও সুখ বিন্দু পরিমাণে সম্ভোগ করিতেছিল, আমেরিকার ব্যবস্থাপক সভার এক কটাক্ষে তাহাদিগের সকল আশা ভাঙ্গিয়া গেল, সকল সুখ স্বপ্নে পরিণত হইল। ব্যাধগণ যেমন পলায়িত মৃগের অনুসরণ করে, দাস ব্যবসায়ীর অনুচরেরা দলে দলে উত্তর প্রদেশ সমূহে সেইরূপে দাসদিগের অনুসন্ধানে ভ্রমণ করিতে লাগিল। এসময়ে মহামতি পার্কার কায়মনোবাক্যে দাসদিগের সহায়তা করিয়াছিলেন। দাসানুসন্ধায়ীদিগকে পরাস্ত করিবার জন্য এসময়েই তিনি বোষ্টনবাসী কতকগুলি যুবাপুরুষকে দলবদ্ধ করিয়াছিলেন।

কতক কাল হইল দক্ষিণ প্রদেশ হইতে পলায়ন করিয়া আসিয়া, উইলিয়ম নামক দাস ও তদীয় পত্নী এলেন বোষ্টন নগরে বসতি করিতেছিল। উহারা পার্কারের প্রতিবেশী ও তদীয় উপাসক-সম্প্রদায়ভুক্ত হইয়া কতককাল সৌজন্যের সহিত জীবন যাপন করিতেছিল বলিয়া, পার্কারের বড় স্নেহের পাত্র হইয়াছিল। এই বিধি প্রচারিত হইলে উইলিয়ম ভয়ে পলায়ন করিল না; ধরিয়া নিতে আসিলেও পার্কারের আনুকূল্যে ও উপদেশে আত্মরক্ষা করিতে প্রস্তুত রহিল। এলেন পার্কারের গৃহে আশ্রয় লইল। এলেনকে আশ্রয় দিয়া পার্কারকে সর্ব্বদাই উৎকণ্ঠিত থাকিতে হইত; এমন কি নিজ বাটীর প্রবেশদ্বার লৌহ-শৃঙ্খলে বদ্ধ করিয়া, এবং বারুদপূর্ণ পিস্তল সম্মুখে রাখিয়া তাঁহাকে অনেক সময়ে ভজনালয়ের উপদেশ লিখিতে হইত। এই উইলিয়ম ও এলেন অনেক কাল হইতেই বিবাহসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল। কিন্তু অধ্যুষিত প্রদেশের রাজনিয়মে সেই বিবাহ সিদ্ধ ছিল না। পার্কার উহাদিগকে যথাবিধি বিবাহ দিলেন, সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিলেন, উইলিয়মের হাতে একখানি ধর্ম্মপুস্তক

ও একখানি তরবারি প্রদান করিয়া কহিলেন, "এই ধর্ম্ম-পুস্তক তোমাদিগের আত্মার উদ্ধারের জন্য প্রদান করিলাম, ইহা সর্ব্বদা ব্যবহার করিবে, আর এই তরবার আত্মরক্ষার জন্য দান করিলাম, ইহা পারতপক্ষে ব্যবহার করিবে না। কিন্তু আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতেছি, যদি কেহ তোমার পত্নীর অঙ্গে হস্ত প্রদান করিতে উদ্যত হয়, তখন ইহা ব্যবহার করিতে পারিবে।" পার্কারের জীবনের কার্য্যগুলি কাব্যের সৌন্দর্য্যে সুশোভিত। উল্লিখিত ঘটনায় তাঁহার হৃদয়ের কি আশ্চর্য্য শোভাই প্রদর্শন করিতেছে। বিবাহান্তে পার্কার দাসদম্পতিকে ইংলণ্ডে প্রেরণ করিয়াছিলেন।

পুরুষসিংহ পার্কার কোন কার্য্যই কাপুরুষের মত করিতেন না। যাহা কর্ত্তব্য মনে করিতেন, তাহাই তারস্বরে ঘোষণা করিতেন, এবং ভয় ভাবনা বা ভালবাসার অপেক্ষা না করিয়া অকাতরে তাহা সম্পন্ন করিতেন। সপত্নীভীতা কুটিলা কামিনী-রাই ক্রূরবুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করে, এবং কাপুরুষেরাই গোপনে অথবা কেবল বাক্যে পুরুষার্থ প্রকাশ করিতে চেষ্টা করে। দাস-দম্পতিকে বিবাহিত ও ইংলণ্ডে প্রেরণ করিবার এক পক্ষ পরে, পার্কার ইউনাইটেড রাজ্যের তাৎকালিক প্রেসিডেণ্টকে পত্র দ্বারা আনুপূর্ব্বিক জানাইলেন। সেই পত্রে লিখিত ছিল, "আমি আমার উপাসক-সম্প্রদায়ের দুই জন লোকের সম্বন্ধে এইরূপ কার্য্য করিয়াছি; আপনি কি বলিতে পারেন যে, এরূপ করিয়া আমি অন্যায় করিয়াছি?" ইহারই নাম যথার্থ কর্ত্তব্য পালন, ইহারই নাম যথার্থ সৎসাহস।

মহামতি পার্কারের পুরুষকার ও সাহসের পরিচয়, আর একটী ঘটনার উল্লেখ করিলেই পর্য্যাপ্ত হইবে। একবার দাসত্বের বিশেষ স্বপক্ষ ও ক্ষমশালী লোকেরা এক সভার উদ্যোগ করি-

য়াছিলেন ; সহস্র সহস্র লোকে সভাগৃহ জনাকীর্ণ হইয়াছিল। বন্ধু বান্ধবের পরামর্শ না শুনিয়া পার্কার সেই উত্তেজিত অসংখ্য-বিরোধীর সভাতে গমন করিলেন। দাসত্বের পক্ষ এতগুলি ক্ষমতাশালী লোক দাসত্বের স্বপক্ষে, ও বিরোধীদিগের আপত্তি খণ্ডন করিতে যাইয়া যে সকল যুক্তি প্রয়োগ করিবে, তাহা স্বকর্ণে শুনিতে হইবে ; ইহাই পার্কারের সেই সভায় উপস্থিত হইবার কারণ। যখন সভা লোকাকীর্ণ হইয়াছে, তখন পার্কার নিঃশব্দে যাইয়া সভাগৃহের মঞ্চের এক পার্শ্বে উপবেশন করিলেন। দাসত্বের স্বপক্ষে অনেকেই অনেক বক্তৃতা করিল। অবশেষে এক জন দাসব্যবসায়ী দণ্ডায়মান হইয়া বলিল, "যে সকল অকাট্য যুক্তি প্রদর্শন করা হইয়াছে, আমরা বড়ই জানিতে ইচ্ছা হয়, সেই পাষণ্ড থিওডোর পার্কার ইহার বিরুদ্ধে আর কিছু বলিতে পারে কি না।" এই কথা উচ্চারিত হইবামাত্র পার্কার পাদপৃষ্ট বিষধরের ন্যায় মঞ্চোপরি দণ্ডায়মান হইয়া কহিলেন,—"থিওডোর পার্কার কি বলিতে পারে, শুনিতে চাও ?" থিওডোরের কথা শুনিয়া সকলেই অবাক্ হইল, এবং তৎক্ষণাৎ বিরোধীগণ "মার মার।" শব্দে চীৎকার করিয়া উঠিল। পুরুষসিংহ পার্কার সে ধমকে ভয় পাইবার লোক ছিলেন না। তিনি দাসত্বপক্ষীয়দিগের দুর্ব্বল যুক্তিগুলি খণ্ড খণ্ড করিতে লাগিলেন, এবং আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুদ্গীরণবৎ দীর্ঘকাল বক্তৃতার অনল বর্ষণ করিলেন। কে সেই তপ্ত কটাহে হস্ত প্রদান করিতে পারে ? তিনি সিংহের মত সদর্পে পদনিক্ষেপ করিয়া সভাগৃহ হইতে চলিয়া গেলেন। তিনি চলিয়া গেলেও বহুক্ষণ পর্য্যন্ত সভাস্থেরা মন্ত্রমুগ্ধবৎ বাক্‌শূন্য হইয়া বসিয়া রহিল।

১৮৫৪ খৃষ্টাব্দে বর্জ্জিনিয়া প্রদেশ হইতে কর্ণেল সাটল্ নামক,

জনৈক উচ্চপদস্থ সৈনিক রাজকর্ম্মচারী এণ্টনি বারণস্ নামক পলায়িত দাসের পুনঃপ্রাপ্তির জন্য বোষ্টন নগরের বিচারালয়ে অভিযোগ করিলেন, তদনুসারে রাবণস্ ধৃত ও অবরুদ্ধ হইল। এই ঘটনাতে অতি গুরুতর আন্দোলন উপস্থিত হইয়াছিল। থিওডোর পার্কার উত্তপ্ত অগ্নিশিখাবৎ বক্তৃতা বর্ষণ করিতে লাগিলেন, তাঁহার বক্তৃতায় উত্তেজিত হইয়া, বারণস্কে মুক্ত করিবার জন্য কতকগুলি লোক বলপূর্ব্বক কারাগারে প্রবেশ করিল, হতভাগ্য বারণসকে উদ্ধার করিতে পারিল না, কিন্তু সেই গোলযোগে এক জন সৈনিক হত হইল। যখন সৈনিকবর্গে পরিবেষ্টিত করিয়া দুর্ভাগ্য বারণস্কে দাসত্বে পুনঃসমর্পণ করিবার জন্য দক্ষিণ প্রদেশে লইয়া যায়, তখন বোষ্টন নগরে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য সংঘটিত হইয়াছিল। কৌতূহল ও বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সহস্র সহস্র লোক রাজপথ অবরুদ্ধপ্রায় করিয়াছিল; দাসত্বের বিরোধী সমাজের উপদেশে নগরের ভজনালয়ের ঘণ্টাসমূহ গভীর শোকধ্বনি করিতেছিল। আমরা কল্পনা-চক্ষে সেই শোকাবহ ঘটনা প্রত্যক্ষ করিয়া, মানুষের সভ্যতার অভিমান ও স্বার্থানুমোদিত ক্রুরবুদ্ধিকে অভিসম্পাৎ করিতেছি।

এই ঘটনা উপলক্ষে, রাজকর্ম্মচারীকে কর্ত্তব্য কর্ম্মে বাধা দেওয়া অপরাধে, পার্কার রাজদ্বারে অভিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু অবশেষে মুক্তিলাভ করেন। বিচারালয় হইতে যাইবার সময় বিচারপতি কহিয়াছিলেন, "এবার আপনি অতি ক্ষুদ্র রন্ধ্রে উদ্ধার পাইলেন।" পার্কার উত্তর করিলেন, "হাঁ তাই বটে; ভবিষ্যতে বৃহত্তর রন্ধ্র করা যাইবে।" এই ঘটনার পরে তিনি আত্মপক্ষ সমর্থন ও দাসত্বের দোষ প্রদর্শন করিয়া, দুই শত বিংশতি পৃষ্ঠা পরিমিত একখানি অতি উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রচার করিয়াছিলেন।

কেবল ধর্ম্ম-সংস্কার বা দাসত্ব নিবারণ পার্কারের জীবনের কার্য্য ছিল না। জনসমাজের দুঃখদুর্গতি নিবারণ জন্য তিনি সর্ব্ববিধ সংস্কারের পক্ষপাতী ছিলেন। তিনি যুদ্ধের একান্ত বিরোধী ছিলেন। টেকশস্ প্রদেশ অধিকারভুক্ত করাতে ইউনাইটেড রাজ্যের সঙ্গে মেকসিকো রাজ্যের যে সংগ্রাম ঘটে, তিনি তাহার গুরুতর প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কোন এক সভাস্থলে বক্তৃতাকালে যুদ্ধেপক্ষ কতকগুলি সৈনিক পুরুষ তাঁহাকে প্রাণনাশের ভয় প্রদর্শন করিলেও তিনি অকুতোভয়ে আত্ম মত ঘোষণা করিয়াছিলেন। তিনি কহিতেন, আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র-ধারণ বা নরহত্যার প্রয়োজন হইতে পারে, কিন্তু এই নীচ ও নিষ্ঠুর সংগ্রামে আমরা কোন মতেই প্রবৃত্ত হইতে পারি না।"

জনসমাজে অসঙ্গত শ্রম-বিভাগ দর্শন করিয়া তিনি অতিশয় ক্ষুণ্ণ ও উদ্বেজিত থাকিতেন। তিনি বলিতেন, "এককালে মানবজাতি যুদ্ধ ও দারিদ্র্যের যন্ত্রণা হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিবে।" তিনি জগতের বর্ত্তমান রাজ্যশাসন-প্রণালীর বড় নিন্দা করিতেন। তিনি বলিতেন,—"যতকাল উহা বলের উপরে প্রতিষ্ঠিত থাকিবে, প্রেমের উপরে প্রতিষ্ঠিত না হইবে, তত কাল উহার ভাক্ততা ঘুচিবে না।" তিনি বলিতেন, "শ্রম বিভাগের দোষে সমাজে দারিদ্র্যের উপত্তি হয়; জনসমাজে যত অপরাধ, তাহার অধিকাংশই দারিদ্র্যজনিত। সুতরাং অল্পদর্শী ও স্বার্থপরসমাজ, প্রথমতঃ লোককে অপরাধ করিতে বাধ্য করিয়া, শেষে সেই অপরাধেরই দণ্ড বিধান করে।" তিনি বলিতেন যে, কারাগারের বর্ত্তমান হীন অবস্থায় অপরাধীর চরিত্র সংশোধন না হইয়া অধিকতর দূষিত হয়। মহামতি পার্কার অলস ও মুখসর্ব্বস্ব আচার্য্যের মত কেবল স্বপ্নদর্শনবৎ এসকল চিন্তা করিতেন না।

তিনি যাহা চিন্তা করিতেন, কার্য্যে তাহাই করিতে, প্রাণপণ করিতেন, তাঁহার জীবনে আমরা ইহার ভূরি ভূরি প্রমাণ পাইয়াছি। কিন্তু জনসমাজের দুর্ভাগ্য বশতঃ অপরিণত বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে! অগ্ন্যুৎপাতের মধ্য-সময়ে যেমন হঠাৎ গিরিমুখ বন্ধ হইয়া যায়, পার্কারের মৃত্যু ঠিক সেইরূপ। আর কিছুকাল জীবিত থাকিলে আমরা সভ্য সমাজের ও চিন্তা-রাজ্যের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত দেখিতে পাইতাম।

পার্কার নারীজাতির হীন দশায় বড় ব্যথিত ছিলেন। তিনি বলিতেন,—"কোন কোন বিষয়ে পুরুষ অপেক্ষা রমণী, ও রমণী অপেক্ষা পুরুষের শ্রেষ্ঠতা আছে বটে, কিন্তু স্ত্রীপুরুষ উভয়েরই জীবন সমান মূল্যবান। অতএব সংসারে ব্যক্তিগত, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার উভয়েরই সমান থাকা উচিত, সন্তান ও সম্পত্তির উপরেও উভয়ের সমান কর্ত্তৃত্ব থাকাই প্রযোজনীয়।" পার্কারের উদার হৃদয় প্রকৃত সাম্যের মর্ম্ম বুঝিতে পারিয়াছিল। তিনি যথার্থ স্ত্রী-স্বাধীনতার স্বপক্ষ ছিলেন। যাহারা অবলাজাতির মুক্তভাবে আহার-বিহারকেই স্বাধীনতা মনে করে, তাহারা ভ্রান্ত। উহা স্বাধীন জীবনের কিয়ৎ পরিমাণে পরিচয় প্রদান করে বটে, কিন্তু মানবের সর্ব্ববিধ অধিকার না পাইলে, প্রকৃত স্বাধীনতা লাভ হয় না। ১৮৫৩ খৃষ্টাব্দে মেসাচুসেটস্ প্রদেশের শাসন-সমাজের সংস্কার ও পুনর্গঠন জন্য যে সভা নিযোজিত হইয়াছিল, স্ত্রীজাতির রাজনৈতিক অধিকার প্রাপ্তির জন্য, কতিপয় বন্ধুর সমভিব্যাহারে পার্কার সেই সভায় আবেদন করিয়াছিলেন।

পার্কারের হৃদয়ের মহত্ত্ব সর্ব্বদিকে এবং সর্ব্ব প্রকারেই অনিন্দনীয় ছিল। যখন তাঁহার অসংখ্য বিরোধী তাঁহাকে নির্য্যাতন ও গ্লানি করিতেছিল, তখনও তিনি অসহিষ্ণু বা প্রতিহিংসা-

পরায়ণ হয়েন নাই। একদা তিনি বলিয়াছিলেন, "আমেরিকা দেশে আমার নামের মত ঘৃণিত নাম আর বোধ হয় বর্ত্তমান সময়ে কাহারও নাই। নরহত্যাকারীর প্রতি লোক যেমন চাহিয়া থাকে, রাজপথে আমার প্রতি লোকে সেইরূপ চাহিয়া থাকে, এবং অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া অপরকে দেখাইয়া দেয়। কিন্তু আমার দুঃখ হ্রাস করিবার একটী উপায় আমি পাইয়াছি, যখন কেহ আমাকে অপমান করে, তখন গোপনে সেই অপমানকারীর কোন উপকার করিতে আমি চেষ্টা করি, এই চেষ্টাতে আমার মনের দুঃখ আশ্চর্য্যরূপে নিবারিত হয়।

তাঁহার চিত্ত দয়া সৌজন্য ও প্রীতি ভক্তিতে পরিপূর্ণ ছিল। প্রতি বর্ষে তাঁহার জননীর সমাধির উপরে যে সকল ভায়লেট পুষ্প প্রস্ফুটিত হইত, লেক্‌সিংটন গ্রামে যাইয়া তিনি সর্ব্বাগ্রে তাহা চয়ন করিয়া আনিতেন। এই কার্য্যটী তাঁহার পক্ষে ধর্ম্মানুষ্ঠানবৎ ছিল। তিনি স্বকীয় ভৃত্য ও পরিচারকদিগের সঙ্গে অনেক সময়ে আমোদ করিতেন। তিনি অনেক সময়ে অযাচিতরূপেও দুঃখীদিগের দুঃখ দূর করিতেন। পশুপক্ষীদিগের প্রতিও তিনি আশ্চর্য্য সদয় ব্যবহার করিতেন। শীত ঋতুতে বোষ্টন নগরের রাজপথ তুষারাবৃত হইলে, আপনার পাঠালয়ের বাতায়নে চাল প্রস্তুত করিয়া তদুপরে নগর-কপোতদিগকে আহার দান করিতেন।

ভূমণ্ডলে এমন সর্ব্বগুণ-সমন্বিত মহাপুরুষ অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। জনসমাজের সৌভাগ্যের হেতু, ও ঊনবিংশ শতাব্দির অদ্বিতীয় অলঙ্কার স্বরূপ দুইটী মনুষ্যরত্ন পৃথিবীতে প্রায় এক সময়ে প্রাদুর্ভূত হয়েন। উহার এক জন পরাধীন ভারতের গভীর তমসার মধ্যে উদয়োন্মুখ প্রভাকরের মত অভ্যুদিত হইয়াছিলেন; আর এক জন দূরবর্ত্তী প্রশান্ত মহাসাগরের পরপারে

সভ্যতা ও স্বাধীনতার ক্রীড়া-ভূমি ইউনাইটেড্‌ রাজ্যের মস্তকে কোটী কহিনুর রূপে স্থাপিত হইয়াছিলেন। উভয়েই স্বকীয় বিশ্বাসের বল ও জ্ঞানের জ্যোতিতে জীবনকে জ্যোতিষ্মান করিয়াছিলেন, এবং ভবিষ্যতে জগতের অপূর্ব্ব শোভা সম্পাদনের অমূল্য উপকরণ সমূহ সঞ্চিত রাখিয়া গিয়াছেন। এই দুই মনুষ্যরত্নের একের নাম রামমোহন রায়, অপরের নাম থিওডোর পার্কার।

এই দুই মহাপুরুষের জীবনের অনেক বিষয়েই অতি আশ্চর্য্য সৌসাদৃশ্য। উভয়েই নানাশাস্ত্র ও বিবিধ ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন; উভয়েই ধর্ম্মানুপ্রাণিত বীরপুরুষের ন্যায় অজস্র অত্যাচার উপেক্ষা করিয়াও সর্ব্ববিধ সংস্কার-ব্রতে ব্রতী হইয়াছিলেন। আরও আশ্চর্য্য এই যে, উভয়েই অতি দূরে ভিন্ন মহাদেশে যাইয়া প্রাণ পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সমগ্র বসুধার সঙ্গে ইঁহাদিগের গৃহ-সম্বন্ধ ছিল, এই ঘটনাতে যেন ইহাই প্রকাশ করিতেছে। বাস্তব কল্পনা-চক্ষে এই ঘটনাকে অতি মনোহর বলিয়াই বোধ হয়; যেন স্বর্গ হইতে দুই জন বীরপুরুষ ভূমণ্ডলের প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য ভাগে অবতীর্ণ হইয়া, আপনাদিগের কার্য্য সমাপনান্তে মধ্যস্থানে যাইয়া অন্তর্ধান হইলেন। ইংলণ্ডের দুই জন রমণীরত্ন ইঁহাদিগের জীবনী ও গ্রন্থাদি প্রচার করিয়া উভয়কেই চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিয়াছেন। ইঁহারা উভয়েই স্ত্রী-জাতির শিক্ষা স্বত্ব ও সদ্গতির জন্য প্রাণপণ যত্ন করিয়াছিলেন; এই ঘটনা ইঁহাদিগের সেই সাধনার কথঞ্চিৎ পুরস্কার স্বরূপ।

বাল্য কালাবধি দারিদ্র্য ও প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে সংগ্রাম করিয়া, এবং তৎপরেও গুরুতর চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া মহামতি পার্কার ক্ষয়-রোগাক্রান্ত হইয়াছিলেন। সেই দারুণ রোগের

বৃদ্ধি হইলে, জল বায়ুর পরিবর্ত্তন দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করিবার মানসে ইটালী দেশে যাইয়া, ফ্লোরেন্স নগরে মানবলীলা সম্বরণ করেন! সুপ্ত শিশু যেমন শয্যাতে অচেতন হইয়া পড়ে, মৃত্যু-কালে তিনিও সেইরূপ ইহলোক পরিত্যাগ করিয়া শান্তির ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। ১৮৬০ খৃষ্টাব্দে তাঁহার পরলোক-প্রাপ্তি হয়, সুতরাং তাঁহার বয়স পঞ্চাশৎ বর্ষমাত্র হইয়াছিল। ফ্লোরেন্স নগরে তাঁহার সামান্য সমাধি-মন্দির বর্ত্তমান রহি-য়াছে। তদীয় কোন চরিতাখ্যায়ক লিখিয়াছেন,—"ইউরোপ খণ্ডে শিল্প সাহিত্য ও সামাজিক উন্নতির বহু কীর্ত্তিস্তম্ভ বিদ্য-মান রহিয়াছে। কিন্তু আমেরিকার শ্রেষ্ঠতম পুত্রের দেহাবশেষ যে স্থানে প্রোথিত, তাহাই আমাদিগের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা প্রধান তীর্থস্থান।" পার্কারের মৃত্যুর পর তদীয় আত্মীয় ও স্বপক্ষীয়গণ তাঁহার স্মরণার্থে বোষ্টন নগরে এক বিস্তীর্ণ সাধারণ অট্টালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন।

কিন্তু এইরূপ সামান্য কীর্ত্তি তাঁহাকে আর অধিক কি স্মরণীয় করিবে? স্বকীয় হৃদয়মনের অমূল্য বৈভব দ্বারা তিনি যে অতুল কীর্ত্তিরাশি স্থাপিত করিয়া গিয়াছেন, তাহাই তাঁহাকে আবহমানকাল সঞ্জীবিত করিয়া রাখিবে। মৃত্যুকালে খিদ্যমান বন্ধুদিগকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি কহিয়াছিলেন—"আমি যাইতেছি বটে, দ্বিতীয় থিওডোর পার্কারকে আমেরিকায় রাখিয়া গেলাম; আমার তিরোধানে সেই উত্থান করিয়া কার্য্য করিবে।" এই ঋষিবাক্য অবশ্যই সার্থক হইবে, এক থিও-ডোরের সাধনার বলে শত শত থিওডোর জন্ম গ্রহণ করিয়া স্বদেশ ও পৃথিবীর মুখ উজ্জ্বল করিবেই করিবে।

সম্পূর্ণ।